দশম অধ্যায়

সকাম কর্মের প্রকৃতি

এই অধ্যায়টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে জৈমিনির অনুগামীদের দর্শনতত্ত্ব নস্যাৎ করেছেন এবং জড় দেহের মধ্যে আবদ্ধ চিন্ময় আত্মা কিভাবে শুদ্ধ অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান বিকাশ করতে পারে, তা উদ্ধবকে বর্ণনা করেছেন।

বৈষ্ণবগণ, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিতজনকে *পঞ্চরাত্র* এবং অন্যান্য দিব্য শাস্ত্রাদির মধ্যে দ্রষ্টব্য বিধিনিয়মাদি পালন করতে হয়। তার নিজের স্বাভাবিক গুণাবলী এবং কর্ম অনুসারে মানুষকে বর্ণাশ্রম প্রথার রীতিনীতি অবশ্যই মেনে চলতে হয় এবং সর্বপ্রকার স্বার্থচিন্তার আগ্রহ আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হয়। নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষের দেখা স্বপ্নগুলি যেমন নিছক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে, তেমনই জড়েন্দ্রিয়গুলি তথা মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান বলতে যা কিছু বোঝায়, তা ঐ স্বপ্নের মতোই অবাস্তব অপ্রয়োজনীয় বলেই স্বীকার করতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে করণীয় সব কাজই বর্জন করা উচিত এবং শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কাজ করা প্রয়োজন। যখনই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই পরম সত্য তখনই সে, কর্তব্যের বশে জড়জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করতে চায় এবং শুধুমাত্র এমন একজন পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিভূ স্বরূপ। পারমার্থিক গুরুদেবের সেবক অবশ্যই তাঁর নিজ গুরুদেবকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করবেন এবং তাঁর কাছ থেকে পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়াসী হবেন আর সকল প্রকার ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং বাচালতা থেকে দূরে থাকবেন। আত্মা বাস্তবিকই জড় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তার পূর্বকর্মের ফল অনুসারে কাজ করতে থাকে। সুতরাং একমাত্র যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুই আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান বিকাশে সক্ষম হন।

জৈমিনি এবং অন্যান্য নাস্তিক দার্শনিকেরা এবং তাদের অনুগামীরা বিধিবদ্ধ জড়জাগতিক কাজ কর্মকে জীবনের উদ্দেশ্য রূপে স্বীকার করে থাকে। তবে শ্রীকৃষ্ণ তা প্রত্যাখান করেছেন তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে, দেহস্থ আত্মা জড়জাগতিক খণ্ডিত মহাকালের যে অংশটিতে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে সে এক অনন্ত জন্ম মৃত্যুর আবর্তমধ্যে চলতে থাকা স্বীকার করে নিয়েছে এবং তাই তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতেও বাধ্য হচ্ছে। এইভাবেই যে মানুষ তার জড়জাগতিক কাজের ফল লাভে আসক্ত হয়ে থাকে, তার পক্ষে

এই জীবনে কোনও প্রকার যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। স্বর্গসুখ কিংবা অন্যান্য লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার সার্থকতা, যা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ করা যায় তার পুণ্যফল অতি অল্পকালের জন্য ভোগ করা চলে। ভোগপর্ব শেষ হলেই, জীবকে এই মর্ত্যে জগতের পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে দুঃখ এবং কষ্টের অংশ গ্রহণের জন্য আবার ফিরে আসতেই হবে। জড়জাগতিক পরিবেশে অবশ্যই কোনও প্রকার অবিচ্ছিন্ন অথবা স্বাভাবিক সুখশান্তি নেই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উদিতেষু**—উক্ত; **অবহিতঃ**—সযত্নে; **স্ব-ধর্মেষু**—ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের কর্তব্য পালনে; **মৎ-আশ্রয়ঃ**—আমাকে আশ্রয় রূপে যে স্বীকার করে; **বর্ণ-আশ্রম**—সামাজিক ও বৃত্তিমূলক বিভাগের বৈদিক প্রথা; **কুল**—সমাজে; **আচারম্**—আচরণ; **অকাম**—জড়জাগতিক বাসনাদি রহিত; **আত্মা**—তেমন মানুষ; **সমাচরেৎ**—আচরণ অভ্যাস করা উচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমার কাছে পূর্ণ আশ্রয় নিয়ে, আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবে ভক্তিমূলক সেবায় সযত্নে মনোনিবেশের মাধ্যমে, বর্ণাশ্রম প্রথা নামে অভিহিত সামাজিক ও বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা বর্জন করে মানুষকে জীবনযাপন করতে হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অবধূত ব্রাহ্মণের কাহিনীর মাধ্যমে সাধুজনোচিত মানুষের গুণাবলী এবং স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। এখন ভগবান সেই ধরনের সাধুজনোচিত মর্যাদা অর্জনের বাস্তব পদ্ধতি প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করছেন। পঞ্চরাত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রাবলীর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) ভগবান বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ* "আমি স্বয়ং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছি।" বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে অগণিত বিধিনিয়মাদি রয়েছে, এবং

যেগুলি ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, ভক্তজনের পক্ষে সেগুলিই আচরণ করা কর্তব্য। *বর্ণ* নামক সংজ্ঞাটির অর্থ এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, কিছু তমোগুণাশ্রিত, কিছু রজোগুণাশ্রিত এবং কিছু সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অভ্যাস মুক্তচিত্ত পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হয়, এবং তাই তমোগুণাশ্রিত মানুষদের জন্য নির্ধারিত কিছু বিধিনিষেধ মুক্তচিত্ত পর্যায়ের মানুষদের জন্য নির্ধারিত বিধিবদ্ধ নীতিনিয়মাবলীর বিরোধী হতেও পারে। অতএব, ভগবানের থেকে অভিন্ন পারমার্থিক সদ্‌গুরুর নির্দেশানুসারে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের পক্ষে অনুকূল পন্থায় মানুষকে বর্ণাশ্রম প্রথার মূলনীতিগুলি অনুসরণ করে চলতে হবে।

শ্লোক ২

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্ ।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্বারম্ভবিপর্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বীক্ষেত—লক্ষ্য করা উচিত; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধচিত্ত; **আত্মা**—জীবাত্মা; **দেহিনাম্**—শরীরধারী জীব; **বিষয়-আত্মনাম্**—যারা ইন্দ্রিয় উপভোগে প্রবৃত্ত; **গুণেষু**—সুখাস্বাদনের জড় বিষয়াদির মাঝে; **তত্ত্ব**—সত্য রূপে; **ধ্যানেন**—চিন্তাভাবনার মাধ্যমে; **সর্ব**—সব কিছুর; **আরম্ভ**—প্রচেষ্টা; **বিপর্যয়ম্**—অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা।

অনুবাদ

শুদ্ধাত্মা পুরুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, বদ্ধ জীবগণ যেহেতু ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে জীবন উৎসর্গ করে, তাই তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সব কিছুকেই অনর্থক সত্যরূপে স্বীকার করে থাকে, যার ফলে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই অবশ্যম্ভাবী বর্থ্যতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে ভগবান কামনা বাসনামুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। রূপ-আকৃতি, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ কিংবা শব্দের মাধ্যমে অনুভূত সবরকম জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই অনিত্য। আমরা এখন আমাদের পরিবার পরিজন এবং দেশ জাতিকে দেখছি, কিন্তু পরিণামে ঐ সব কিছুই বিলীন হয়ে যাবে। এমন কি আমাদের যে শরীরটির মাধ্যমে আমরা ঐ সব কিছু অনুধাবন করছি, সেটিও বিলীন হয়ে যাবে। এইভাবেই জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের অপরিহার্য পরিণামই হল বিপর্যয়, অর্থাৎ বিপুল দুঃখকষ্ট। *বিশুদ্ধাত্মা* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবদ্ভক্তিমূলক বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম সাধনাদির মাধ্যমে যাঁরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁরা

সুস্পষ্টভাবেই জড়জাগতিক জীবনের হতাশাচ্ছন্ন ব্যর্থতা অবলোকন করতে পারেন, এবং তাই তাঁরা *অকামাত্মা* অর্থাৎ জড়জাগতিক কামনা বাসনামুক্ত মহাত্মা হয়ে উঠেন।

শ্লোক ৩

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ ।
নানাত্মকত্বাদ্ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ ॥ ৩ ॥

সুপ্তস্য—যে ঘুমন্ত; **বিষয়**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **আলোকঃ**—লক্ষ্য করে; **ধ্যায়তঃ**—যে গভীরভাবে চিন্তা করে; **বা**—কিংবা; **মনঃ-রথঃ**—নিতান্তই মনের সৃষ্টি; **নানা**—বহু বিচিত্র প্রকার; **আত্মক-ত্বাৎ**—সেই প্রকৃতি সম্পন্ন; **বিফলঃ**—যথার্থ সার্থকতা বিহীন; **তথা**—সেই ভাবে; **ভেদ-আত্ম**—ভিন্ন ভাবে গঠিত; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **গুণৈঃ**—জড়েন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে।

অনুবাদ

ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহু জিনিস দেখতে পারে, কিন্তু ঐসকল সুখকর সব কিছুই নিতান্ত মানসিক কল্পনা মাত্র এবং তাই শেষপর্যন্ত অহেতুক। সেইভাবেই, জীবমাত্রই তার চিন্ময় পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন হয়ে থাকে, তার দৃষ্টিতেও বহু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদি আসে, কিন্তু ঐসকল অস্থায়ী উপভোগের অগণিত বিষয়বস্তু নিতান্তই ভগবানের মায়াবলে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির কোনই স্থায়ী সত্তা নেই। ঐগুলি নিয়ে যে মানুষ মনঃসংযোগ করে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় সে অনর্থক তার বুদ্ধি বৃত্তির অপব্যয় করতে থাকে।

তাৎপর্য

যেহেতু জড়জাগতিক কাজকর্মের ফলগুলি অস্থায়ী হয়, তাই সেগুলি মানুষ লাভ করতে পারল কি না পারল, তাতে কিছুই যায় আসে না; চরম পরিণাম একই থাকে। জড়জাগতিক কাজকর্ম কখনই জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদান করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলির তাড়নায় জড়জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তি প্রবলভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা করতে থাকে। তাই তাকে এখানে *ভেদাত্মধীঃ* বলা হয়েছে, ঐ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষকে তার যথার্থ শুদ্ধ স্বার্থবোধের চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এইভাবেই জড়জাগতিক অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়াদির মধ্যে মগ্ন হয়ে জাগতিক প্রগতির অগণিত বিষয়াদি অনুধাবনে বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ ধরনের ভেদাত্মবুদ্ধি শক্তিহীন হয় এবং পরমতত্ত্ব স্বরূপ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তদের অবশ্য একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাদের বুদ্ধি নিবদ্ধ করবার পদ্ধতি জানা আছে। তাঁরা শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা এবং ভক্তমণ্ডলী নিয়ে মনোনিবেশ করতে জানেন, এবং তাই তাঁদের বুদ্ধি কখনই পরমতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) আছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

"যারা এই পথ অবলম্বন করেছে, তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন, অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।"

মানুষ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী না হয়, তা হলে তার নিত্য স্থিতির মর্যাদা সম্পর্কে কোনও প্রকার ধারণা ছাড়াই অযথা স্বপ্নবিলাস করতে থাকে। জড়জাগতিক বুদ্ধি বৃত্তি সকল সময়েই সুখ অন্বেষণের জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে থাকবে, এবং তাই মানুষ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভের একটি নিষ্ফল কর্ম প্রচেষ্টা থেকে অন্য আরও একটিতে লাফিয়ে চলে যাবে, তবু প্রকৃত সত্য রহস্যটিতে মনোযোগ দিতে সে পারবে না। মানুষ বুঝতে পারে না যে, সকল জড়জাগতিক বস্তুই অস্থায়ী এবং বিলীন হয়ে যাবে। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি জড়জাগতিক কামনার লোভে কলুষিত হয়ে যায় এবং সেই কলুষ বুদ্ধির ফলে মানুষ জীবনের যথার্থ লক্ষ্যের অভিমুখী হতে পারে না। এইভাবে মানুষ শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন পারমার্থিক সদ্গুরুর উপদেশ লাভের গুরুত্ব বোঝে এবং তখন জীবনের চরম সার্থকতা স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৪

নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ ।
জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্ ॥ ৪ ॥

নিবৃত্তম্—বিধিবদ্ধ কর্তব্য কর্ম; **কর্ম**—সেই কর্ম; **সেবেত**—পালন করা উচিত; **প্রবৃত্তম্**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কাজকর্ম; **মৎ-পরঃ**—যে আমাতে আত্মসমর্পিত; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **জিজ্ঞাসায়াম্**—পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে; **সম্প্রবৃত্তঃ**—নিষ্ঠাভরে নিয়োজিত থেকে; **ন**—না; **আদ্রিয়েৎ**—স্বীকার করা উচিত; **কর্ম**—যে কে. জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **চোদনাম্**—সেই বিষয়ে বিধি নিষেধাদি।

অনুবাদ

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে আমাকে সুদৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে যে স্থান দিতে পেরেছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল কাজকর্ম বর্জন করা উচিত এবং তার পরিবর্তে বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি অনুসারে উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করা কর্তব্য। অবশ্য যখন আত্মার পরমতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হয়, তখন তাকে সকাম কর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি আর পালন করবার প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, *জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তঃ* শব্দসমষ্টির দ্বারা *যোগারূঢ়* ব্যক্তি অর্থাৎ যৌগিক প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ মানুষকে বোঝানো হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/৩-৪) বলা হয়েছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥

"অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যাঁরা ইতিমধ্যে যোগারূঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন। যখন যোগী জড় সুখ ভোগের সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত রহিত হন, তখন তাঁকেই যোগারূঢ় বলা হয়।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনও সাধারণ মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নারীসঙ্গ উপভোগের প্রয়াসী হবে। এই ধরনের প্রয়াসকে বলা হয় *প্রবৃত্তকর্ম* অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পথ। ধর্মপ্রাণ মানুষও নারীসঙ্গ উপভোগ করবেন, তবে বর্ণাশ্রম প্রথার বিধিবদ্ধ নীতির অধীনেই তিনি তা করবেন। অবশ্যই, পারমার্থিক উন্নতি বিকাশের পথে যিনি পূর্ণ একাগ্রতা অর্জন করেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত মৈথুন সঙ্গ জনিত সর্বপ্রকার বৈধ কিংবা অবৈধ সুখভোগের বাসনাই পরিত্যাগ করবেন। সেইভাবেই, *প্রবৃত্তকর্ম* অনুশীলনের পর্যায়ে অর্থাৎ সাধারণ জীবনে ইন্দ্রিয় উপভোগের ক্ষেত্রে, মানুষমাত্রই তার রসনাতৃপ্তির জন্য যা কিছু ইচ্ছা হয়, তা সবই আহার করবে। অন্যদিকে, জড়জাগতিক ভগবদ্ভক্ত কখনও উপাদেয় খাদ্যবস্তু সামগ্রী তৈরি করবে এবং তা শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে, তা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিজেরই জিহ্বা ও উদরের তৃপ্তির জন্য তা করতে

থাকবে। অবশ্য, যিনি *সম্প্রবৃত্ত,* অর্থাৎ পারমার্থিক চেতনা উন্মেষের সাধনায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োজিত, তিনি কখনই শুধুমাত্র তাঁর নিজের রসনা পরিতৃপ্তির বিষয়ে আগ্রহবোধ করবেন না। জড়জাগতিক মানুষদের তৈরি সাধারণ খাদ্যসামগ্রী তিনি পরিহার করে চলেন এবং শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবার অভিলাষে নিজ শরীর কর্মক্ষম রাখবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রীতিসাধনের জন্য শ্রীবিগ্রহের কাছে সর্বাগ্রে নিবেদিত আহার্য সামগ্রী থেকে সামান্য পরিমাণে প্রসাদ আহার করে থাকেন।

পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে বদ্ধজীব জড়জাগতিক চেতনার সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে ক্রমশ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের স্তরে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভগবানের প্রীতিসাধনের বাসনা নিয়ে মানুষের সমস্ত রকম উপভোগ্য বিষয়াদি তথা সর্বপ্রকার কর্মফল প্রথমেই ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে শেখানো হয়। উন্নত পর্যায়ে অবশ্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের (*কর্মচোদনাম্*) প্রবৃত্তি আর থাকে না, এবং মানুষ তখন শুধুমাত্র ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বপ্রকার স্বার্থচিন্তা ব্যতিরেকেই সব কিছু সমর্পণ করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত সর্বত্যাগী গৃহস্থকেও গার্হস্থ্য জীবনে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করে চলার প্রয়োজন হয় না। শেষ পর্যন্ত, প্রত্যেক মানুষকেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন সম্পর্কিত দিব্য কর্তব্যকর্মেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিজের অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করার পরে কর্মফল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করার চেয়ে, শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিলাষ অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার মতো কাজকর্মে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োজিত থাকাই উচিত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, ধর্মমতে কিংবা অধর্মমতে যেভাবেই জড় জগতটিকে উপভোগ চেষ্টা করা হোক, শেষপর্যন্ত তার পরিণাম বিভ্রান্তিপূর্ণ হবেই। মানুষকে বাসনাশূন্য যথার্থ জীবনচর্যায় উন্নীত হতেই হবে এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে হবে, তা হলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

শ্লোক ৫

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥ ৫ ॥

যমান্—হত্যা করা অনুচিত এবং এই ধরনের মূল অনুশাসনাদি; অভীক্ষ্ণম্—সর্বদাই; **সেবেত**—পালন করা কর্তব্য; **নিয়মান্**—শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মতো সাধারণ অনুশাসনাদি; **মৎপরঃ**—আমার স্বরূপে আমাকে যে জ্ঞাত হয়েছে; **ক্বচিৎ**—যথাসম্ভব; **মৎ-অভিজ্ঞম্**—আমার স্বরূপ যে জানতে পারে; **গুরুম্**—পারমার্থিক গুরুদেব; **শান্তম্**—শান্তিপূর্ণ; **উপাসীত**—সেবা করা উচিত; **মৎ-আত্মকম্**—আমা হতে অভিন্ন।

অনুবাদ

জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে আমাকে যে স্বীকার করেছে, তার পক্ষে পাপকর্মাদি পরিহার সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে পালন করা উচিত এবং যথাসম্ভব শুচিতা রক্ষার মতো সামান্য বিধিনিষেধগুলিও প্রতিপালন করা প্রয়োজন। অবশেষে, মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হবে, যিনি আমার মতেই সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত, যিনি প্রশান্ত এবং যিনি পারমার্থিক দিব্য চেতনার মাধ্যমে আমা হতে অভিন্ন।

তাৎপর্য

যমান্ শব্দটির দ্বারা মানুষের শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মূল অনুশাসনগুলির কথা বোঝানো হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সকল শুদ্ধাচারী যথার্থ ভক্তসদস্যকেই মাছ, মাংস এবং ডিম খাওয়া বর্জন করতেই হয়, এবং তাছাড়া তাদের নেশাভাং করা, জুয়াখেলা এবং অবৈধ মৈথুন সংসর্গও অবশ্যই বর্জন করতে হয়। *অভিজ্ঞম্* কথাটি বোঝায় যে, কোনও মানুষ যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও যেন কখনও ঐ ধরনের নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত না হয়। *নিয়মান্* শব্দটি কিছু স্বল্প বাধ্যতামূলক অনুশাসনাদি বোঝায়, যেমন দিনে তিনবার স্নান করা। কিছু কঠিন পরিস্থিতির মাঝে, মানুষ দিনে তিনবার স্নান না করতেও পারে, তা সত্ত্বেও তার পারমার্থিক মর্যাদা রক্ষা করে চলতেও পারে। কিন্তু যদি কেউ যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও নিষিদ্ধ পাপকর্মে লিপ্ত হয় তা হলে নিঃসন্দেহে তার পারমার্থিক অবনতি হবে। শেষপর্যন্ত *শ্রীউপদেশামৃত* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র বিধিনিয়মাদি পালনে নিষ্ঠাবান হলেই চলবে না, তাতে পারমার্থিক উন্নতি করা যায় না। নিষ্ঠাবান মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে, যে গুরুদেবকে বলা যায় *মদভিজ্ঞম্* অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ। মৎ (আমাকে) শব্দটি বোঝায় যে যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মনে পারমার্থিক পরমতত্ত্বের কোনও নিরীশ্বরবাদী ধারণা থাকার কোনও সম্ভাবনা যেন না থাকে। তা ছাড়া গুরুদেব অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণভাবে

নিয়ন্ত্রিত রাখবেন। কারণ, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ফলে, তেমন পারমার্থিক গুরুদেব *মদাত্মকম্* হয়ে উঠেন, অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য সত্তার অভিন্ন মর্যাদা লাভ করেন।

শ্লোক ৬

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥

অমানী—মিথ্যা অহমিকাশূন্য; **অমৎসরঃ**—নিজেকে সকল কর্মের কর্তা না বিবেচনা করা; **দক্ষঃ**—অলসতা বিহীন; **নির্মমঃ**—নিজ স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সমাজ ইত্যাদি কোনও কিছুতেই মমতাবিহীন তথা প্রভুত্ববোধশূন্য; **দৃঢ়-সৌহৃদঃ**—আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ পারমার্থিক গুরুদেবের সাথে প্রেমময় সখ্যতার ভাবে আবদ্ধ; **অসত্বরঃ**—জড়জাগতিক রজোগুণের প্রভাবে বিভ্রান্ত না হওয়া; **অর্থ-জিজ্ঞাসুঃ**—পরম তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানান্বেষী; **অসূয়ুঃ**—ঈর্ষাদ্বেষবর্জিত; **অমোঘ-বাক্**—বাচালতা মুক্ত।

অনুবাদ

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্যকে অবশ্যই মিথ্যা অহমিকামুক্ত হতে হবে এবং কখনই নিজেকে সকল কর্মের কর্তা বিবেচনা করা চলবে না। তাকে সকল সময়ে কর্মদক্ষ এবং নিরলস হতে হবে আর তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ ও সমাজ সকল বিষয়ে মমতাশূন্য ও প্রভুত্ববোধহীন হওয়া প্রয়োজন। তার পারমার্থিক গুরুর প্রতি প্রেমময় সখ্যভাবাপন্ন হতে হবে এবং কখনই বিভ্রান্ত বা বিপথগামী হলে চলবে না। সেবক তথা শিষ্যরূপে তাকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে, কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে চলবে না এবং স্বল্পবাক হওয়া প্রয়োজন।

তাৎপর্য

কোনও মানুষই তার স্ত্রী, পরিবার, ঘর, সমাজ ইত্যাদি বলতে যা কিছু বোঝায় তার কোনটারই চিরদিনের প্রভু বা মালিক বলে দাবি করতে পারে না। সমুদ্রের উপরে ফেনার মতোই ঐ ধরনের সামাজিক তথা জাগতিক সম্পর্কগুলি সৃষ্টি হয় এবং লোপ পায়। কোনও মানুষই তার ঘরবাড়ি, সমাজ এবং পরিবারবর্গ যা কিছু জাগতিক বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে, তার কোনটারই সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করতে পারে না। যদি এমন ঘটনা সত্য হত যে, পিতামাতারাই তাঁদের সন্তানদের দেহগুলির প্রকৃত স্রষ্টা, তাহলে সন্তানেরা কখনই তাদের পিতামাতার সামনে মৃত্যুবরণ করত না। তখন পিতামাতারা অনায়াসে সন্তানদের জন্য নতুন শরীর

সৃষ্টি করতেই পারতেন। তেমনই, পিতামাতারাও মৃত্যুবরণ করতেন না, যেহেতু তাঁরা নিজেরাই নিজেদের নতুন শরীর সৃষ্টি করে নিতে পারতেন এবং পুরানো মৃত শরীর ফেলে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই প্রত্যেকের শরীর সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত জড়জাগতিক পদার্থ যা দিয়ে আমার জড়জাগতিক সমাজ গড়ে তুলি, তা সবই ভগবান সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই সব কিছু আমাদের কাছ থেকে মৃত্যু টেনে নিয়ে যাওয়ার আগেই সেই সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ স্বরূপ পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের প্রেমময়ী সেবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিবেদন করা উচিত। তা হলে ঐ সমস্ত জড়জাগতিক বস্তুই দুঃখ সৃষ্টির পরিবর্তে সুখের কারণ হয়ে উঠবে।

শ্লোক ৭

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু ।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

জায়া—স্ত্রীর প্রতি; **অপত্য**—সন্তানাদি; **গৃহ**—ঘর; **ক্ষেত্র**—জমি; **স্বজন**—আত্মীয় ও বন্ধুগণ; **দ্রবিণ**—সঞ্চিত ধন; **আদিষু**—এবং অন্য সব কিছু; **উদাসীনঃ**—অন্যমনোভাবাপন্ন থাকা; **সমম্**—সমভাবে; **পশ্যন্**—দেখার ফলে; **সর্বেষু**—এই সব কিছুতে; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **ইব**—মতো; **আত্মনঃ**—নিজের মতো।

অনুবাদ

জীবনের সকল পরিবেশের মধ্যেই মানুষকে আপন যথার্থ শুভ স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীপুত্র, পরিবার পরিজন, ঘরসংসার, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ এবং সবকিছু থেকেই অনাসক্ত থাকা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যেই তাঁর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজন, ঘরসংসার, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ সবকিছুই নিয়োজিত করতে হবে। সুতরাং তিনি কখনই তাঁর নিজের পরিবারবর্গ এবং বন্ধুবান্ধবদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না। তাঁর স্ত্রীপুত্র কন্যার প্রভু হয়ে উঠার জন্য আগ্রহ বোধ করেন না কিংবা বন্ধুবান্ধব আর সমাজের কাছ থেকে মান সম্মানের জন্য উদ্বিগ্ন হন না। সেই কারণে কারও প্রতি তাঁর ঈর্ষাবোধ থাকে না এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির চর্চায় তাঁর কোনও আলস্য বোধ হয় না। প্রভুত্ব করবার অকারণ বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা

বিকশিত করতে আগ্রহবোধ করেন। বৃথা আত্মম্ভরিতার মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বভাবতই অকারণ জড়জাগতিক বাচালতা থেকে দূরে থাকেন। সেই কারণেই তিনি সর্বদা দৃঢ়মনোভাবাপন্ন হন এবং খেয়ালখুশিমতো কোনও কাজ করেন না, আর তাই গুরুদেবের শ্রীচরণকমলে প্রেমময়ী সেবার পরিবেশে তিনি সদাসর্বদাই সুস্থির হয়ে থাকতে পারেন।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, বৃথা প্রভুত্ববোধ থেকে কিভাবে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা যেতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। যে কোনও সাধারণ মানুষই আরও বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে বিশেষ আগ্রহবোধ করে থাকে, এবং তার অর্থসম্পদ সে, কোম্পানী শেয়ার, সরকারি-বেসরকারী ঋণপত্র, ব্যাঙ্কের হিসাব, জমিবাড়ি, সোনা জহরত এবং এমনি সব ক্ষেত্রে গচ্ছিত রাখে। যতদিন এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি থেকে তার আর্থিক শুভফল লাভ হতে থাকে, ততদিন সেইগুলি সে সমান চোখে দেখে এবং সেইগুলি তারই সম্পদ বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু যদি কখনও তার সেই সব সম্পত্তি থেকে সরকার কর বাবদ খানিকটা নিয়ে নেয়, কিংবা যদি কোনও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ফলে ব্যবসায়িক কারণে সেই সব হারিয়ে যেতে দেখে, তখন সে ঐসব সম্পত্তির মালিকানার ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই প্রত্যেক মানুষেরই বুদ্ধিমানের মতো লক্ষ্য করা উচিত যে, অগণিত জড়জাগতিক সামগ্রীর উপরে কারও প্রভুত্ব বা মালিকানার ধারণা কখনই স্থায়ী হয় না; সুতরাং এই সবকিছু থেকেই মনকে অনাসক্ত করে রাখার চর্চা করা শিখতে হয়। যদি মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তসমাজ ও পারমার্থিক গুরুদেবের প্রতি প্রেমময়ী সেবার মনোভাব অনুশীলন না করে, তাহলে নিঃসন্দেহে জড়জাগতিক সমাজ সখ্যতা আর প্রেম ভালবাসার মোহজালে জড়িত হয়ে পড়তেই হবে। তার ফলে স্থায়ী সুখভোগের আশা বর্জন করে জড়জাগতিক স্তরেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

শ্লোক ৮

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্ দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্ ।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্ দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ৮ ॥

বিলক্ষণঃ—বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি সম্পন্ন; **স্থূল**—স্থূল সামগ্রী থেকে; **সূক্ষ্মাৎ**—এবং সূক্ষ্ম; **দেহাৎ**—শরীর থেকে; **আত্মা**—চিন্ময় আত্মা; **ঈক্ষিতা**—দর্শক; **স্ব-দৃক্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন; **যথা**—যেভাবে; **অগ্নিঃ**—আগুন; **দারুণঃ**—জ্বালানী কাঠ

থেকে; **দাহ্যাৎ**—দাহ্য পদার্থ থেকে; **দাহকঃ**—দহনকারী; **অন্যঃ**—অন্যান্য; **প্রকাশকঃ** —আলোকিত করে।

অনুবাদ

আগুন যেমন দহনের মাধ্যমে আলোক প্রদান করে, অথচ তা দাহ্য কাঠ থেকে ভিন্ন, তবু কাঠ দহনের মাধ্যমে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে; তেমনই শরীরের মধ্যে যে দর্শক রয়েছে, তা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন চিন্ময় আত্মা এবং তা জড় শরীর থেকে ভিন্ন হলেও চেতনার দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। তাই চিন্ময় আত্মা এবং শরীর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, জড় দেহের সঙ্গে কখনই অহম্‌বোধ একাত্ম মনে করা অনুচিত। ঐ ধরনের ভ্রান্ত একাত্ম বোধকে বলা হয় জাগতিক বিভ্রান্তি তথা অহমিকা। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যেহেতু সাধারণত সকলেই জানে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই বদ্ধ আত্মাকে জ্ঞানালোক প্রদান করে থাকেন, তবে কেন *স্ব-দৃক্* অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন' শব্দটি এই শ্লোকে ব্যবহার করা হয়েছে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যদিও জীবকে অবশ্যই চেতনা প্রদান করেছেন, তবু জীব ভগবানের শক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত বলে নিজেই তাঁর শুদ্ধ চেতনা পুনরুজ্জীবিত এবং প্রসারিত করতে সক্ষম হতে পারে। সুতরাং পরোক্ষ ভাবধারায় তাকে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সোনা কিংবা রূপার চূড়ায় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল দেখায়। সেই উজ্জ্বলতা আলো যদিও সূর্য থেকেই আসে, তা হলেও সোনা এবং রূপার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকেও উজ্জ্বলতা প্রতিফলনের কারণ রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেহেতু অন্য কোনও বস্তুর তেমন কোনও যথার্থ গুণবৈশিষ্ট্য নেই, যা থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। তেমনই, চিন্ময় আত্মাকে *স্ব-দৃক্* অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সত্তা বলা যেতে পারে, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিমত্তার প্রতিফলনে উজ্জ্বলতা বিকীরণের সামর্থ্য তার রয়েছে, তাই তার নিজের সত্তার বিকাশে অস্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করতে পারে, যেভাবে সোনা কিংবা রূপার চূড়া থেকে তার প্রতিফলনের গুণবৈশিষ্ট্যের কারণেই সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়।

শরীর এবং আত্মার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আগুনের দহন এবং আলোক প্রদান ক্ষমতা থাকলেও, যে বস্তুটিকে নিয়ে আগুনের দহনের ফলে আলোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে, সেই

বস্তুটি থেকে আগুন ভিন্ন। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কাঠের মধ্যেই অব্যক্ত রূপে আগুন থাকে। তেমনই, অজ্ঞানতার আধার বদ্ধ জীবনের মধ্যেও চিন্ময় আত্মা রয়েছে, যদিও তা শরীরের মধ্যে অব্যক্ত প্রতীয়মান হয়। জীবসত্তার জ্ঞান সঞ্জীবিত অবস্থাটিকে কাঠের মধ্যে আগুন সৃষ্টির পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন আগুন অচিরেই কাঠ পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তেমনই চিন্ময় আত্মা সঞ্জীবিত হলে অজ্ঞানতার অন্ধকার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আমরা দেহ সম্পর্কে সচেতন; অতএব বলা যেতে পারে যে, শরীরটিকে চেতনার দ্বারা আলোকিত করা হয়, সেই চেতনা অর্থাৎ চিন্ময় আত্মার লক্ষণ একটি শক্তি। শরীর এবং আত্মাকে একই সত্তা মনে করা যেন আগুন এবং কাঠকে একই বস্তু মনে করার মতোই নির্বুদ্ধিতা। উভয় ক্ষেত্রেই, আগুন এবং কাঠের সম্পর্ক কিংবা আত্মা ও দেহের সম্পর্ক থাকলেও আগুন আর কাঠ যে ভিন্ন পদার্থ বা আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন, সেই সত্যের কোনও পরিবর্তন হয়না।

শ্লোক ৯

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্ ।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্ত এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥

নিরোধ—সুপ্ত; উৎপত্তি—অভিব্যক্তি; অণু—ক্ষুদ্র; বৃহৎ—বিশাল; নানাত্বম্—বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি; তৎ-কৃতান্—তার দ্বারা উৎপন্ন; গুণান্—গুণাবলী; অন্তঃ—মধ্যে; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; আধৎ-তে—গ্রহণ করে; এবম্—এইভাবে; দেহ—জড় শরীরের; গুণান্—গুণাবলী; পরঃ—পারমার্থিক সত্তা।

অনুবাদ

যেমন আগুন বিভিন্নভাবে সুপ্ত, উগ্র, ক্ষীণ, উজ্জ্বল এবং আরও নানাভাবে দাহ্য পদার্থের অবস্থাভেদে প্রকাশ পেতে পারে, তেমনই, চিন্ময় আত্মা কোনও জড় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিশেষ দৈহিক গুণাবলী ব্যক্ত করে।

তাৎপর্য

যদিও আগুন কোনও বিশেষ পদার্থের মধ্যে জ্বলতে এবং নিভে যেতে পারে, তাহলেও আগুন নামক সত্তাটি নিত্য বিরাজমান থাকে। তেমনই, চিন্ময় আত্মা কোনও এক উপযুক্ত শরীরের মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং পরে সেই শরীর থেকে অন্তর্হিত হয়, কিন্তু আত্মা সর্বদাই বিরাজমান থাকে। যেমন আগুন তার দাহ্য পদার্থটি থেকে ভিন্ন, তেমনই আত্মাও শরীর থেকে ভিন্ন। একটি দেশলাই কাঠি ছোটি একটু আগুন জ্বালায়, সেক্ষেত্রে বিশাল তৈলাধার বিস্ফোরণ হলে আকাশে

আগুনের শিখা লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু, তা হলেও আগুন একই। তেমনই, একটি চিন্ময় আত্মা ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করে থাকতে পারে, আর অন্য একটি পিঁপড়ের শরীরেও এক আত্মা থাকতে পারে, কিন্তু গুণগতভাবে প্রত্যেক শরীরেই আত্মা এক ও সমান। অজ্ঞানতার ফলে আমরা আত্মার সঙ্গে শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করে থাকি, এবং তাই আমরা বলতে থাকি যে, অমুক লোকটি আমেরিকান, রাশিয়ান, না হয় চীনা, আফ্রিকান কিংবা মেক্সিকান, কিংবা লোকটা বৃদ্ধ, না হয় জোয়ান। যদি ঐ ধরনের নাম পরিচয়গুলি অবশ্যই শরীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলি কখনই চিন্ময় আত্মার পরিচয় প্রদান করে না, কারণ আত্মাকে বলা হয়েছে *পরঃ* অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা। যতক্ষণ বিভ্রান্ত চিন্ময় আত্মা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে, ততদিন স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরাদির নাম উপাধিগুলি নিয়ে নিজের চারদিকে জড়িয়ে রাখে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেকে রেখে দেয়। যদি কেউ বুদ্ধিবৃত্তি সহকারে নিজেকে জীবনের বিভিন্ন জড়জাগতিক দর্শনতত্ত্বের সাথে একাত্ম বোধ সম্পন্ন করে তোলে, তা হলে সে সূক্ষ্ম মনের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। পরিণামে, যা বিদ্যমান থাকে তা সবই পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশে। যখন জীব তা উপলব্ধি করে, তখন *নিরুপাধি*, অর্থাৎ জড়জাগতিক উপাধিমুক্ত হয়। এই হল তার স্বরূপ সত্তা।

শ্লোক ১০

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি ।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

যঃ—যা; **অসৌ**—যে (সূক্ষ্ম শরীর); **গুণৈঃ**—জড় গুণাবলীর দ্বারা; **বিরচিতঃ**—সৃষ্ট; **দেহঃ**—শরীর; **অয়ম্**—এই (স্থূল দেহ); **পুরুষস্য**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **হি**—অবশ্যই; **সংসার**—জড় জাগতিক অস্তিত্ব; **তৎ-নিবন্ধঃ**—তার সাথে আবদ্ধ; **অয়ম্**—এই; **পুংসঃ**—জীবসত্তার; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **চিৎ**—যা ছেদন করে; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে বিস্তারিত জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহগুলি। যখন জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহগুলিকে তার নিজেরই বাস্তব প্রকৃতি সম্মত বলে ভ্রান্ত ধারণা করে তখনই জড়জাগতিক অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে অবশ্যই এই মায়াময় পরিস্থিতির বিনাশ ঘটানো যেতে পারে।

তাৎপর্য

আগুন এবং তার জ্বালানী পদার্থের সঙ্গে আত্মা এবং শরীরের তুলনা প্রসঙ্গে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে যে, আগুন কিছু পরিমাণে তার জ্বালানী পদার্থের উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকে এবং তাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকে না। যেহেতু আমরা জ্বালানী পদার্থ ব্যতিরেকে আগুনের অস্তিত্বের কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করিনি, তাই মানুষের মনে আরও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, শরীর থেকে পৃথক ভাবে জীবের কেমন করে বেঁচে থাকা সম্ভব, কিভাবে দেহের আচ্ছাদন লাভ করতে পারবে এবং পরিণামে তা থেকে মুক্ত হতেও পারে। কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারাই মানুষ জীবতত্ত্বের প্রকৃতি পরিষ্কার দ্বন্দ্বভাবে উপলব্ধি করা যায়। *বিদ্যা*, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে, মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং ইহজীবনেই চিন্ময় সত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, জড়জাগতিক অস্তিত্ব এক প্রকার কৃত্রিম পরিস্থিতির প্রভাব মাত্র। ভগবানের অচিন্তনীয় অজ্ঞানতার মায়াবলে, জড়জাগতিক রূপগুলির স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়জাগতিক অভিপ্রকাশ জীবের উপর আরোপিত হয়ে থাকে এবং যেহেতু মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দোষে নিজের দেহটিকেই স্বরূপ সত্তাজ্ঞান করে, তাই জীবগণকে ক্রমান্বয়ে মায়াময় ক্রিয়াকলাপের অধীন হতে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বর্তমান জড় দেহটি যেন একটি গাছের মতো, যে গাছটি থেকে পর জন্মের শরীরটির উপযোগী কর্মবীজ রোপণ করা হয়। অবশ্য, অজ্ঞানতার এই চক্রটিকে ভগবানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দিব্য জ্ঞানের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বদ্ধ জীবেরা ভগবানের কথিত যথার্থ জ্ঞান স্বীকার করে না। তার পরিবর্তে তারা স্থূল ও সূক্ষ্ম মায়াময় ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকে। কিন্তু যদি জীব মাত্রেই ভগবানের জ্ঞান অর্জন করে, তা হলে তার সমগ্র জীবনধারা সংশোধিত হয়ে যেতে পারে, এবং সে তাহলে ভগবানের প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানের জগতে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ১১

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্ ।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **জিজ্ঞাসয়া**—জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে; **আত্মানম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **আত্ম**—আপনসত্তার মধ্যে; **স্থম্**—অবস্থিত; **কেবলম্**—শুদ্ধ; **পরম্**—পারমার্থিক এবং পরমতত্ত্ব; **সঙ্গম্য**—আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির মাধ্যমে; **নিরসেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **এতৎ**—এই; **বস্তু**—জড়জাগতিক সামগ্রীর মধ্যে; **বুদ্ধিম্**—বাস্তব সত্যের ধারণা; **যথা-ক্রমম্**—ক্রমশ, ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

সুতরাং, জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে তার অন্তরে বিরাজমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ পারমার্থিক দিব্য সত্তা উপলব্ধির মাধ্যমে জড় জগতটিকে স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা রূপে ভ্রান্তধারণা ক্রমশ বর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

তাৎপর্য

যথাক্রমম্ (ক্রমে ক্রমে) শব্দটি অর্থ এই যে, স্থূল জড় দেহটি থেকে প্রথমে নিজের ভিন্ন সত্তা রূপে উপলব্ধির পরে, জড়জাগতিক মানসিক ক্রিয়াকলাপগুলি থেকে নিজেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া উচিত। এই শ্লোকটিতে *এতদ্ বস্তু বুদ্ধিম্* শব্দ সমষ্টির অর্থ এই যে, জড় জগতটিকে পরম তত্ত্বেরই অভিপ্রকাশরূপে সকল বস্তুর যথার্থ অবলোকন না করে তার পৃথক স্বতন্ত্র সত্তারূপে উপলব্ধির ভ্রান্ত বুদ্ধি।

নিজেকে নিত্যসত্তাবিশিষ্ট চিন্ময় রূপের অভিব্যক্তি স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করতে পারলে, তখন মানুষ জ্ঞানের যথার্থ সুফল উপভোগ করতে পারে। ভগবান তাঁর নিত্যরূপে নিত্য অভিব্যক্তই রয়েছেন, এবং জীবও তার নিত্যরূপে ভগবানের প্রেমময় সেবকের মতো তেমনই অভিব্যক্ত রয়েছে। যখন আমরা বৃথা মনে করি যে, অনিত্য অস্থায়ী মায়াময় বস্তুগুলি সত্য, তখনই আমাদের নিত্য দিব্য রূপের জ্ঞান অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। অবশ্য, যদি মানুষ সবকিছুর মধ্যেই ভগবানের পরম স্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে, তা হলে মানুষ দিব্য জীবনের স্বাভাবিক আনন্দময় পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এই শ্লোকের মধ্যে *জিজ্ঞাসয়া* শব্দটির মাধ্যমে যেভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে প্রত্যেক মানুষেরই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ১২

আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ১২ ॥

আচার্যঃ—পারমার্থিক গুরুদেব; অরণিঃ—যজ্ঞাহুতির জন্য ব্যবহৃত পবিত্র জ্বালানী কাঠ; আদ্যঃ—নিচে রাখা হয়; স্যাৎ—বিবেচিত হয়ে থাকে; অন্তে-বাসী—শিষ্য; উত্তর—সর্বোপরি; অরণিঃ—জ্বালানী কাঠ; তৎ-সন্ধানম্—মাঝখানের যে কাঠিটি উপরের এবং নিচের কাঠ সংযুক্ত করে; প্রবচনম্—উপদেশাবলী; বিদ্যা—দিব্যজ্ঞান; সন্ধিঃ—জ্বালানী কাঠের মধ্যে অগ্নিবিস্তারের জন্য ঘর্ষণজনিত আগুনের মতো; সুখ—সুখ; আবহঃ—আনয়ন করে।

অনুবাদ

পারমার্থিক গুরুদেবকে যজ্ঞাগ্নিতে ব্যবহৃত অরণি কাষ্ঠের আদি কাষ্ঠ স্বরূপ মনে করা উচিত, শিষ্যকে সর্বোপরি জ্বালানী কাষ্ঠ এবং গুরুদেবের উপদেশাবলীকে এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত তৃতীয় সন্ধিকাষ্ঠ রূপে বিবেচনা করা চলে। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যের কাছে আসে যেন যজ্ঞের উপর নিচে কাষ্ঠের সংঘর্ষজনিত আগুনের মতো, যে আগুন অজ্ঞানতার অন্ধকার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, ফলে গুরু ও শিষ্য অপার আনন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞানতার অন্ধকার যখন ভস্মীভূত হয়, তখন অজ্ঞানতার ভয়াবহ জীবনও লোপ পায়, এবং তখন মানুষ পূর্ণজ্ঞানে নিজের যথার্থ আত্ম স্বার্থ অনুসারে কাজ করতে পারে। এই শ্লোকটিতে *আদ্যঃ* শব্দটির অর্থ 'আদি' এবং তার দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে বোঝানো হয়েছে, কারণ তাঁকে যজ্ঞের পবিত্র কাঠের জ্বালানী স্বরূপ সর্বনিম্নে কাঠ খানির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকেই দিব্য জ্ঞান আগুনেরই মতো শিষ্যের দিকে ছড়িয়ে যায়। দুটি কাঠের মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে যেভাবে আগুন সৃষ্টি হয়, তেমনই পারমার্থিক গুরুদেব যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ, এবং নিষ্ঠাবান শিষ্যের মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। যখনই শিষ্য তার পারমার্থিক গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই আপনা হতেই তার আদি অকৃত্রিম দিব্য রূপের সার্থক জ্ঞান লাভ করে।

শ্লোক ১৩

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধিঃ
ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্ ।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ং চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৩ ॥

বৈশারদী—বিশারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত; **সা**—এই; **অতি-বিশুদ্ধ**—অতি শুদ্ধ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি বা জ্ঞান; **ধুনোতি**—খণ্ডন করে; **মায়াম্**—মায়াকে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে; **সম্প্রসূতাম্**—সৃষ্টি হয়; **গুণান্**—সেই জড়গুণাবলী থেকেই; **চ**—ও; **সন্দহ্য**—সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে; **যৎ**—যে সকল গুণাবলী থেকে; **আত্মম্**—সৃষ্টি হয়; **এতৎ**—এই (জড় অস্তিত্ব); **স্বয়ম্**—নিজেই; **চ**—ও; **শাম্যতি**—শান্তি হয়; **অসমিৎ**—জ্বালানী ছাড়া; **যথা**—যেভাবে; **অগ্নিঃ**—আগুন।

অনুবাদ

সুদক্ষ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকে বিনীতভাবে শ্রবণের মাধ্যমে, সুদক্ষ শিষ্য শুদ্ধ জ্ঞান বিকশিত হওয়ার ফলে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য থেকে উৎপন্ন জড়জাগতিক মায়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। অবশেষে এই শুদ্ধ জ্ঞান আপনা হতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যেভাবে জ্বালানী কাঠ শেষ হয়ে গেলে আগুনও নিভে যায়।

তাৎপর্য

সংস্কৃত শব্দ *বৈশারদী* মানে 'বিশারদ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করা জ্ঞান'। বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান অভিজ্ঞ গুরুদেবের কাছ থেকেই আসে, এবং সেই ধরনের জ্ঞান যখন অভিজ্ঞ শিষ্য শ্রবণ করে, জড়জাগতিক মায়ার প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়। যেহেতু ভগবানের মায়াশক্তি জড়জগতে নিত্যকাল সক্রিয় রয়েছে, তাই মায়াকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তবে নিজের অন্তরে মায়ার প্রভাব বিনষ্ট করা যেতে পারে। এই কাজটি আয়ত্ত করতে হলে, অভিজ্ঞ গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিষ্যকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মানুষ যতই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সার্থকতার পর্যায়ে অগ্রসর হতে থাকে এবং সর্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে থাকে, ততই তার মনোযোগ পারমার্থিক দিব্য স্তরে উন্নীত হতে থাকে। সেই সময়ে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষের মায়ামোহ বিষয়ক নিত্য নিপুণ অভিজ্ঞতা ও সচেতনতাও হ্রাস পেতে থাকে, যেমন জ্বালানী ফুরিয়ে যাবার পরে আগুন হ্রাস পেতে পেতে নির্বাপিত হয়ে যায়।

শ্রীল মধ্বাচার্য কতকগুলি বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন যে, মায়ামোহ ঠিক ডাকিনীর মতোই সদাসর্বদা বদ্ধ জীবগণকে আক্রমণ করে চলেছে। জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মধ্যে যা কিছু প্রয়োজন হয়, বদ্ধ জীবগণকে মায়া তা সবই এনে দেয়, কিন্তু ঐ সমস্ত কিছুই ঠিক আগুনের মতো হৃদয় দগ্ধ ও ভস্মীভূত করতে থাকে। সুতরাং, প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত যে, জড় জগৎ এমন এক নারকীয় স্থান যেখানে কোনও কিছুতেই মানুষ স্থায়ী ফল লাভ করতে

পারে না। বহির্জগতে আমরা বহু জিনিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করি, এবং অন্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকি এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রম নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করি। এইভাবেই অন্তরে এবং বাইরে আমরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে পড়ি। যথার্থ জ্ঞান আসে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে, অর্থাৎ যাকে আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই শুদ্ধ জ্ঞানের গ্রন্থ রূপ মনে করে থাকি। যদি আমরা ভগবানের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠি, তা হলে আনন্দ সুখের কোনই অভাব ঘটবে না, কারণ ভগবানই সকল আনন্দের উৎস, এবং তাঁরই ভক্তবৃন্দ সেই সুখসাগরে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন।

শ্লোক ১৪-১৬

অথৈষাং কর্মকর্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥
মন্যসে সর্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা ।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥ ১৫ ॥
এবমপ্যঙ্গ সর্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ ॥ ১৬ ॥

অথ—এইভাবে; **এষাম্**—সেইগুলির; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **কর্তৃণাম্**—কর্মীদের; **ভোক্তৃণাম্**—উপভোগকারীদের; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **নানাত্বম্**—বৈচিত্র্য; **অথ**—তা ছাড়া; **নিত্যত্বম্**—নিত্যকালের স্থিতি; **লোক**—জড়জাগতিক পৃথিবীর; **কাল**—জড়জাগতিক সময়; **আগম**—সকাম কর্মের অনুমোদনকারী বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার; **আত্মনাম্**—এবং নিজে; **মন্যসে**—যদি তুমি মনে করো; **সর্ব**—সবকিছুর; **ভাবানাম্**—জড় বস্তুসামগ্রীর; **সংস্থা**—প্রকৃত পরিস্থিতি; **হি**—অবশ্যই; **ঔৎপত্তিকী**—মূল; **যথা**—যেভাবে; **তৎ তৎ**—সকল বিভিন্ন বিষয়াদির; **আকৃতি**—যেগুলি আকৃতির; **ভেদেন**—পার্থক্যের দ্বারা; **জায়তে**—জন্ম নেয়; **ভিদ্যতে**—এবং পরিবর্তিত হয়; **চ**—এবং; **ধীঃ**—বুদ্ধি বা জ্ঞান; **এবম্**—এইভাবে; **অপি**—যদিও; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **সর্বেষাম্**—সব কিছুর; **দেহিনাম্**—দেহ বিশিষ্ট সত্তা; **দেহ-যোগতঃ**—জড় দেহের সংস্পর্শে; **কাল**—সময়ের; **অবয়বতঃ**—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **সন্তি**—থাকে; **ভাবাঃ**—অস্তিত্ব; **জন্ম**—জন্ম; **আদয়ঃ**—এবং অন্য কিছু; **অসকৃৎ**—নিত্য।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, এইভাবেই তোমার কাছে আমি শুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁরা আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, সকাম কাজকর্মে নিয়োজিত থাকাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং তারা জীবকে তার নিজের কর্ম থেকে উপলব্ধ সুখ ও দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে থাকেন। এই জড়জাগতিক দর্শন অনুসারে, পৃথিবী, সময়, দিব্য শাস্ত্রাদি এবং আত্মা সবই বৈচিত্রময় এবং নিত্যস্থিত সত্তা, যেগুলি অবিরাম পরিবর্তনের ধারায় অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া, জ্ঞান কখনই একমাত্র বিষয় কিংবা নিত্যস্থিত হতে পারে না, কারণ তা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে; তাই জ্ঞান মাত্রই নিত্য পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়। যদিও তুমি এই ধরনের দার্শনিক মতবাদ স্বীকার কর, হে উদ্ধব, তা হলেও নিত্যকালের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থাকবেই, যেহেতু কালের প্রভাব মতো জড় দেহ অবশ্যই সকল জীবকে স্বীকার করতেই হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিম্নরূপ কথাগুলি উদ্ধবকে বলছেন। "হে উদ্ধব, আমি এই মাত্র যে উপদেশ তোমাকে দিয়েছি, তার মধ্যে জীবের যথার্থ লক্ষ্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অবশ্য কিছু লোক, বিশেষ করে জৈমিনি কবির অনুগামীরা, আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকে। যদি তুমি তাদের উপলব্ধির প্রতি অনুকূল অভিমত পোষণ কর এবং আমার উপদেশগুলি স্বীকার না কর, তা হলে যা ব্যাখ্যা করছি, তা মন দিয়ে শোন।

"জৈমিনির অনুগামীদের মতে, জীব মূলত এবং স্বভাবত সকাম ক্রিয়াকর্মের অনুশারী হয়, এবং তার নিজের কাজকর্মের ফল থেকে তার সুখ ও দুঃখ সে আহরণ করে। যে জগতের মাঝে জীবগণ তাদের আনন্দ সুখ উপভোগ করে, যে সময়ের মধ্যে তারা উপভোগ করে, যে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রাদি আনন্দ সুখ আহরণের ব্যাখ্যা প্রদান করে, এবং যে সূক্ষ্ম ক্ষণভঙ্গুর শরীরের মাধ্যমে জীবগণ সুখভোগ করে, তা সবই বহু বিচিত্র রূপে বিরাজমান রয়েছে এবং শুধু তাই নয়, সেগুলি নিত্যকাল বিরাজ করছে।

"বিভিন্ন জড়জাগতিক বস্তুর অস্থায়িত্ব লক্ষ্য করে, এবং বিভিন্ন ঘটনাদি, পরিস্থিতি, সবই মায়াময় মনে করে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবৃত্তি থেকে জীবের অনাসক্তি সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নেই। ঐ ধরনের জড়জাগতিক

দর্শনচিন্তা অনুসারে, পুষ্পমাল্য, চন্দন বা সুন্দরী রমণী বিশেষ রূপের মাঝে অনিত্য অস্থায়ী বটে, কিন্তু সৃষ্টি এবং বিনাশের স্বাভাবিক ধারার মাঝে সেইগুলি নিত্য বিরাজমান রয়েছে। অন্য ভাষায়, কোনও বিশেষ রমণীর রূপ অস্থায়ী হতে পারে, তবু জড় জগতের মধ্যে সুন্দরী রমণী চিরকালই থাকবে। এইভাবে, ধর্মশাস্ত্রাদি অনুসারে সযত্নে সকাম যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মানুষ সারা জীবন ধরে রমণী এবং ঐশ্বর্যের সুখ সান্নিধ্যে অতিবাহিত করতেই পারে। এইভাবেই মানুষের ইন্দ্রিয় উপভোগ অনন্তকাল চলতে পারে।

"জৈমিনি দার্শনিকেরা আরও বলেন যে, এমন কোনও সময় ছিল না, যখন এই পৃথিবী আজ যেভাবে রয়েছে, সেইভাবে তার অস্তিত্ব ছিল না, যা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই পৃথিবী সৃষ্টির জন্য কোনও পরম নিয়ন্তা নেই। তারা দাবি করে যে, এই পৃথিবীর ব্যবস্থা সবই বাস্তব এবং যথাযথ হয়েছে এবং তাই মায়াময় নয়। তা ছাড়া, তারা বলে যে, আত্মার আদি অকৃত্রিম নিত্যরূপ সম্পর্কে কোনই চিরন্তন জ্ঞান নেই। বস্তুত, তারা বলে, পরম তত্ত্ব থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, তা সৃষ্টি হয় জড়জাগতিক বস্তুগুলির পার্থক্য থেকে। জ্ঞান সেইজন্যই নিত্য সত্য নয় এবং তা পরিবর্তনসাপেক্ষ। এই ভাবধারায় অন্তর্নিহিত ধারণা এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় অপরিবর্তনশীল বাস্তব সত্যের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী কোনও চিন্ময় আত্মা বলে কিছুই নেই। বরং, চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতিই নিত্য পরিবর্তনশীল। অবশ্য তারা বলে যে, চেতনার নিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ফলে নিত্য তত্ত্বের বিরোধিতা করা হয় না। চেতনা নিত্য বিরাজমান রয়েছে, এই তত্ত্ব তারা স্বীকার করলেও তারা বলে যে, চেতনা একই রূপ নিয়ে বিরাজ করে না।

"এইভাবে, জৈমিনি অনুগামীরা সিদ্ধান্ত করে যে, জ্ঞানের নিত্য পরিবর্তনশীলতার ফলে তার চিরন্তন নিত্যতা অস্বীকার করা হয় না; বরং তারা বলে যে, জ্ঞানের পরিবর্তনশীলতার নিত্য নৈমিত্তিক প্রকৃতির মধ্যেই জ্ঞান নিত্য বিরাজমান রয়েছে। এইভাবে তারা স্বভাবতই নিরাসক্তির পন্থার চেয়ে বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগের পথেই অগ্রসর হয়েছে, কারণ মুক্তির অবস্থায়, জীবের কোনও প্রকার জাগতিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি থাকবে না, এবং তাই জড়জাগতিক উপলব্ধির কোনও পরিবর্তনও সম্ভব হবে না। ঐ ধরনের দার্শনিকেরা মনে করে যে, মুক্তিলাভের পরে যে স্থিতাবস্থা বিরাজ করতে থাকবে, তার ফলে জীবের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ বা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে এবং তার ফলে সেটি তার স্বার্থরক্ষার অনুকূল হবে না। নিবৃত্তির পন্থা (জড় জগতের প্রতি অনাসক্তি এবং উত্তরণের মনোভাব) স্বভাবতই ঐ ধরনের জড়বাদী দার্শনিকদের কাছে মনঃপূত হয় না। নিছক তর্কের খাতিরেও যদি ঐ ধরনের

জড়জাগতিক দর্শনতত্ত্ব স্বীকার করা হয়, তা হলে মানুষ অনায়াসে উপস্থাপন করতে পারে যে, বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের পন্থার মাধ্যমে জীবগণের আচরণে বহু অবাঞ্ছিত এবং শোচনীয় পরিণাম ঘটতে থাকে। সুতরাং জড়জাগতিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতেও অনাসক্তি বাঞ্ছনীয়। জড়জাগতিক সময় নানাভাবে দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বছরে বিভক্ত করা আছে এবং জড়জাগতিক কালের হিসাবেই জীবকে বারংবার জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেই হয়। ঐ ধরনের বাস্তব দুঃখদুর্দশা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই সংঘটিত হয়, তা সর্বজনবিদিত।" এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক দর্শন তত্ত্বের ভ্রান্তি উদ্ধবের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

আমরা এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, জৈমিনি এবং তার অগণিত আধুনিক অনুগামীদের নাস্তিক দর্শনতত্ত্ব যদি মানুষ অযথা স্বীকার করে, তা হলে জীবগণকে অনন্তকাল জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির যন্ত্রণার আবদ্ধ হয়ে থাকতেই হবে। এই অর্থহীন ভ্রান্ত নাস্তিক দর্শনতত্ত্ব জীবনের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য স্বরূপ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের উৎসাহ প্রদান করে থাকে কিন্তু বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের পন্থা অবলম্বনের ফলে জীব অবশ্যম্ভাবীরূপে বিভ্রান্তির কবলায়িত হবে এবং তার পরিণামে নরকগামী হবে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই বিষয়ে উদ্ধবকে বলেছেন যে, এই জড়জাগতিক দর্শনতত্ত্ব ভ্রান্ত এবং জীবের যথার্থ স্বার্থ রক্ষার প্রতিকূল।

শ্লোক ১৭

তত্রাপি কর্মণাং কর্তুরস্বাতন্ত্র্যং চ লক্ষ্যতে ।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো ন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সুখলাভের সামর্থ্য বিষয়ে; **অপি**—আরও; **কর্মণাম্**—সকাম ক্রিয়াকর্মের; **কর্তুঃ**—কর্মীর; **অস্বাতন্ত্র্যম্**—স্বাতন্ত্র্যের অভাব; **চ**—আরও; **লক্ষ্যতে**—স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়; **ভোক্তুঃ**—যে ভোগের চেষ্টা করছে; **চ**—আরও; **দুঃখ-সুখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখ; **কঃ**—কি; **নু**—অবশ্য; **অর্থঃ**—মূল্য; **বিবশম্**—যে অনিয়ন্ত্রিত; **ভজেৎ**—সিদ্ধান্ত হতে পারে।

অনুবাদ

যদিও সকাম কর্মী অনন্ত সুখের বাসনা করে, তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে, জড়জাগতিক কর্মীরা প্রায় অসুখী হয়ে থাকে এবং কেবল মাঝে মাঝেই সন্তোষলাভ করে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তারা

স্বাধীন স্বতন্ত্র নয় কিংবা পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করতেও অক্ষম। যখন কোনও মানুষ অন্য কারও প্রভুত্বময় নিয়ন্ত্রণে সর্বদা চলতে থাকে, তবে সে কেমন ভাবে তার নিজের সকাম ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে কোনও মূল্যবান সুফল আশা করতে পারে?

তাৎপর্য

যদিও জড়বাদী মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যাখ্যান করে এবং তার পরিবর্তে অস্থায়ী ইন্দ্রিয় উপভোগের পন্থা অবলম্বন করে, তা সত্ত্বেও ভোগ উপভোগ তাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। যদি মানুষ বাস্তবিকই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তা হলে সে নিজের সমস্যা নিজেই সৃষ্টি করবে কেন? কোনও বুদ্ধিমান মানুষই তার নিজের জীবনে কিংবা প্রিয়জনদের জীবনে মৃত্যু, জরা কিংবা ব্যাধির প্রভাব স্বীকার করতে চায় না। মানুষকে তাই বুঝতে হবে যে, এই সব অবাঞ্ছিত দুঃখ দুর্দশা উচ্চতর কোনও শক্তির প্রভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসে। যেহেতু আমরা সকলেই স্পষ্টতই পরম শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছি, তাই মানুষকে শুধুমাত্র সকাম ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হতে এবং সুখী জীবন সৃষ্টি করতে পরামর্শ দেয় যে নাস্তিক দর্শনতত্ত্ব, তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ভাবধারা মাত্র।

কালের প্রভাবে সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি হয়। যখন নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়, তখন তার পতি, আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা সাগ্রহে সন্তান জন্মের প্রতীক্ষায় থাকে। সময় হলে শিশুর জন্ম হওয়ার পরে, প্রত্যেকেই বিপুল সুখ অনুভব করে। কিন্তু শিশু যেমন বড় হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং অবশেষে তার মৃত্যু হয়, সেইভাবেই কালক্রমে দুঃখের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ মানুষেরা বৃথাই বিজ্ঞানিদের কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে থাকে, কারণ ঐ সব বিজ্ঞানীরা প্রচণ্ডভাবে এবং বৃথা চেষ্টায় তাদের গবেষণাগারগুলিতে কাজ করতে থাকে মৃত্যু নিবারণ করার উদ্দেশ্যে। আধুনিক কালে, আবিষ্কারের ফলে জীবনের নানা অসুবিধা দূর করার পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেই সমস্ত সুবিধাজনক পন্থাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে দুর্বিষহ অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে, তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। একমাত্র অতিশয় নির্বোধ মানুষই বলবে যে, কোনও পরম নিয়ন্তা নেই এবং জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের সুদক্ষ সুচারু সমাধা করতে পারলেই মানুষ শুভফল অর্জন করতে পারে। পরিণামে সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মই অহেতুক, কারণ সেগুলির ফললাভ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েই থাকে। যদি কেউ গাড়ি চালায় কিন্তু নিয়ন্ত্রণক্ষমতা তার সামান্য তাহলে অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয় এবং অবশ্যই দুর্ঘটনা ঘটবে। তেমনই, জড়জাগতিক দেহটিকে সুখশান্তি উপভোগের দিকে চালিত করতে আমরা যদিও চেষ্টা করে চলেছি, তবু দেহের দাবিদাওয়াগুলি

পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আমরা অক্ষম, এবং তাই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩) বলা হয়েছে—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" যদি কোন মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হয়, তবে তার কাজকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হয় নিতান্তই *মৃত্যুসংসার*—জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

শ্লোক ১৮

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বিদুষামপি ।
তথা চ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবের; **সুখম্**—সুখ; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **বিদ্যতে**—আছে; **বিদুষাম্**—যারা বুদ্ধিমান তাদের; **অপি**—ও; **তথা**—সেইভাবে; **চ**—ও; **দুঃখম্**—দুঃখ; **মূঢ়ানাম্**—মহা মূর্খদের; **বৃথা**—বৃথা; **অহঙ্করণম্**—মিথ্যা অহমিকা; **পরম্**—একমাত্র কিংবা সম্পূর্ণভাবে।

অনুবাদ

জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক সময়ে বুদ্ধিমান মানুষও সুখী হয় না। তেমনই, কখনও এক মহামূর্খও সুখী হয়। জড়জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনের দক্ষতার মাধ্যমেই সুখী হয়ে ওঠার ধারণা নিতান্তই মিথ্যা অহমিকার অনর্থক অভিপ্রকাশ মাত্র।

তাৎপর্য

যুক্তিসহকারে বলা যেতে পারে যে, জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে ধর্মকর্ম সাধনের দক্ষতার মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষ কখনই দুঃখভোগের মাঝে কষ্ট পায় না, যেহেতু পাপকর্মের ফলেই দুঃখ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য, আমরা প্রায়ই ধর্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মানুষদেরও মধ্যে বিপুল দুঃখকষ্টের ঘটনা লক্ষ্য করে থাকি, কারণ তারা তাদের কর্তব্য সাধনে কখনও ব্যর্থ হয় এবং কখনও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে থাকে। এই যুক্তিতে ভগবান এমন মতবাদ খণ্ডন করতে চান যে, মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন না করলেও শুধুমাত্র জড়জাগতিক ধর্মপ্রাণতার শুভফল স্বরূপ চিরন্তন সুখ উপভোগ করতে পারে।

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অতি নির্বোধ কিংবা পাপী হলেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সুখ উপভোগ করতে থাকে, কারণ যারা সম্পূর্ণভাবে পাপকর্মেই জীবন ভরিয়ে রেখেছে, তারাও ঘটনাক্রমে কোনসময়ে অন্য মনস্কভাবেও পবিত্র তীর্থস্থানের মধ্য দিয়ে গমন করে কিংবা কোনও সাধু পুরুষকে সাহায্য করে থাকে। ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টি বৈচিত্র্য এমনই জটিল ও বিভ্রান্তিকর যে, ধর্ম কর্মে আত্মস্থ মানুষও কখনও পাপ করে থাকে, এবং যারা পাপময় জীবনধারায় অভ্যস্ত, তারাও মাঝে মাঝে ধর্ম কর্ম সাধন করে থাকে। সুতরাং জড়জগতের মধ্যে একান্ত অবিচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখ আমরা কোথাও লক্ষ্য করি না। বরং, প্রত্যেক বদ্ধ জীবই যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বিভ্রান্তির মাঝে ভেসে চলেছে। পুণ্য এবং পাপ আপেক্ষিক জড়জাগতিক ধারণা, যা থেকে আপেক্ষিক সুখ এবং দুঃখ জাগে। একমাত্র পরিপূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন তথা ভগবৎ প্রেমের পারমার্থিক পর্যায়ে পরম সুখ উপভোগ করা চলে। তাই জড়জাগতিক জীবনধারা সদাসর্বদাই বিভ্রান্তিকর এবং আপেক্ষিক গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, অথচ কৃষ্ণভাবনামৃতই প্রকৃত সুখ।

শ্লোক ১৯

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা ॥ ১৯ ॥

যদি—যদি; **প্রাপ্তিম্**—ফলপ্রাপ্তি; **বিঘাতম্**—দূরীকরণ; **চ**—ও; **জানন্তি**—তারা জানে; **সুখ**—সুখের; **দুঃখয়োঃ**—এবং দুঃখের; **তে**—তারা; **অপি**—তবু; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **ন**—না; **বিদুঃ**—জানে; **যোগম্**—পদ্ধতি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **প্রভবেৎ**—প্রভাব বিস্তার করবে; **যথা**—যেভাবে।

অনুবাদ

যদিও মানুষ জানে কিভাবে সুখ অর্জন করতে হয় এবং দুঃখ পরিহার করতে হয়, তবু তারা জানে না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

তাৎপর্য

তথাকথিত জড়বাদী বুদ্ধিমানরা যদি সুখলাভের এবং দুঃখ বিনাশের পদ্ধতি জানে তা হলে অবধারিত মৃত্যু থেকে মানুষকে উদ্ধার করা তাদের উচিত। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাজ করে চলেছে, কিন্তু যেহেতু তারা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে, তাই বোঝা গেছে যে, তারা বাস্তবিকই বুদ্ধিমান নয় এবং সুখলাভের ও দুঃখ মোচনের উপায় তারা জানে না। কারও মাথার উপরে খড়্গ

ঝুলতে থাকলে সে সুখবোধ করতে পারে, তা চিন্তা করাই একান্ত নির্বুদ্ধিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি স্বয়ং তোমার সামনে মৃত্যুরূপে উপস্থিত হয়ে সব কিছু নিয়ে যাই।" জড়জাগতিক জীবনের এই বিপর্যয়ের ব্যাপারটি অন্ধের মতো অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়, বরং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে যে অহৈতুকী কৃপা অকাতরে বিতরণ করেছেন, তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তনের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের যথার্থ উপায় দেখিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁরই শ্রীচরণকমলে আমাদের আত্মনিবেদন করা কর্তব্য। ভগবানের তাই অভিলাষ এবং আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

শ্লোক ২০

কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে ।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ২০ ॥

কঃ—কি; **নু**—অবশ্যই; **অর্থ**—জড়জাগতিক বস্তু; **সুখয়তি**—সুখ প্রদান করে; **এনম্**—কোনও মানুষকে; **কামঃ**—জড়জাগতিক সামগ্রী থেকে লব্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগ; **বা**—কিংবা; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **অন্তিকে**—নিকটে দণ্ডায়মান; **আঘাতম্**—মৃত্যুদণ্ডের স্থানে, **নীয়মানস্য**—যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; **বধ্যস্য**—যাকে বধ করা হবে; **ইব**—মতো; **ন**—মোটেই নয়; **তুষ্টি-দঃ**—তৃপ্তি প্রদান করে।

অনুবাদ

মৃত্যু কখনই সুখকর নয়, এবং যেহেতু প্রত্যেক মানুষকেই ঠিক যেন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতোই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি থেকে যা সুখতৃপ্তি ভোগ করা যেতে পারে, তা থেকে কতখানি সুখই বা মানুষ পেতে পারে?

তাৎপর্য

সারা জগতে প্রথা আছে যে, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মানুষকে পরম উপাদেয় শেষ খাবার খেতে দেওয়া হয়ে থাকে। মৃত্যুদণ্ডভোগী মানুষটির কাছে অবশ্য সেই ধরনের ভোজ নিতান্তই তার অবধারিত আসন্ন মৃত্যুর বার্তা বহন করেই আনে এবং সেই জন্যই সেই ভোজ তার কাছে মোটেই উপভোগ্য মনে হয় না। তেমনই কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষেই জড়জাগতিক জীবনে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ মৃত্যু নিকটেই থাকে এবং যে কোনও মুহূর্তে তা আঘাত হানতে পারে। যদি কেউ বসবার ঘরের কাছেই একটি সাপকে নিয়ে বসে থাকে এবং বুঝতে পারে যে, ঐ

সাপটি যে কোনও মুহূর্তে তার বিষাক্ত ফণা তার দেহে বিদ্ধ করতে পারে, তা হলে কেমন ভাবে শান্তিতে সে ঐ ঘরে বসে বসে দূরদর্শন উপভোগ কিংবা গ্রন্থপাঠ করতে পারবে? তেমনই নিতান্ত উন্মাদ গ্রস্ত না হলে, কেউই জড়জাগতিক জীবনে উৎসাহিত হতে কিংবা শান্তিপূর্ণ হয়ে থাকতে পারে না। অবধারিত মৃত্যুর কথা চিন্তা করার মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ হলে, মানুষ পারমার্থিক জীবনে সুস্থির হতে উৎসাহ বোধ করে।

শ্লোক ২১

শ্রুতং চ দৃষ্টবদ্ দুষ্টং স্পর্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥

শ্রুতম্—জড়জাগতিক সুখের কথা যা শোনা যায়; **চ**—ও; **দৃষ্টবৎ**—আমরা ইতিপূর্বে যা দেখেছি, তারই মতো; **দুষ্টম্**—কলুষিত; **স্পর্ধা**—ঈর্ষাবশে; **অসূয়া**—শত্রুতা; **অত্যয়**—মৃত্যুর দ্বারা; **ব্যয়ৈঃ**—এবং ক্ষয়ের দ্বারা; **বহু**—অনেক; **অন্তরায়**—বাধা বিপত্তি; **কামত্বাৎ**—ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্যাদিসহ সুখ মেনে নেওয়া; **কৃষি-বৎ**—কৃষিকার্যের মতো; **চ**—ও; **অপি**—এমন কি; **নিষ্ফলম্**—ফলহীন।

অনুবাদ

যে জড়জাগতিক সুখের কথা শোনা যায়, যেমন, স্বর্গলোকে সুখভোগ, তা সবই আমরা যে সকল জড়জাগতিক সুখের পরিচয় পেয়েছি, তারই মতো। সবই ঈর্ষা, দ্বেষ, জরা এবং মৃত্যুর দ্বারা কলুষিত। অতএব তেমনই শস্য আহরণ করাও বৃথা হয়, যদি শস্যের ব্যাধি, কীটের আক্রমণ কিংবা অনাবৃষ্টির মতো বহু সমস্যা থাকে, আর সেই রকমই পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গলোকে যেখানেই হোক, অগণিত বাধাবিপত্তির কারণেই সর্বদাই কোনওখানেই জড়জাগতিক সুখ আহরণের চেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন— "সাধারণত, বিশেষ কোনও বাধাবিপত্তি না থাকলে, কৃষিকার্যের প্রচেষ্টায় ফল লাভ করা যায়। অবশ্য যদি বীজের মধ্যেই কোনও দোষ থাকে, কিংবা জমির মাটি খুব বেশি নোনা কিংবা অনুর্বর হয়, অথবা যদি অনাবৃষ্টি, মড়ক, অতিবৃষ্টি কিংবা খরাজনিত অত্যধিক উত্তাপ সৃষ্টি হয়, কিংবা যদি পশুপাখি বা কীটপতঙ্গের উপদ্রব থাকে, তাহলে কৃষিকাজের আশানুরূপ ফসল লাভ হয় না। তেমনই জড়জাগতিক পৃথিবীর সব কিছু বিশ্লেষণে অভিজ্ঞব্যক্তিরা লক্ষ্য করেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রাদিতে

স্বর্গীয় পরিবেশের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা সবই মূলত পৃথিবীর জীবনধারা থেকে পৃথক্ নয়। বদ্ধ জীবগণের মধ্যে মেলামেশার ফলে অবধারিতভাবে ঈর্ষা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবেই, যেহেতু একজন শ্রেষ্ঠতার শিখরে উন্নীত হয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হলে এবং অন্যজন হীনমন্য হলে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েই থাকে। কালের প্রভাবে এই সকল মর্যাদা বিপরীতমুখী হয়ে যায়, এবং তার ফলে স্বর্গলোকেও হিংসা দ্বন্দ্ব ও জটিল মনোভাবের সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টাই নানা সমস্যা ও জটিলতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবানের রাজ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধাম এই পৃথিবীর জড়জাগতিক প্রকৃতিগত বিধিনিয়মাদির সীমাবদ্ধতা এবং বিভ্রাটগুলি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। যদি কেউ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করে যে, ঐ ধরনের ত্রুটিগুলি ভগবদ্ধামেও আছে, তা হলে জড়জাগতিক কলুষতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।"

শ্লোক ২২

অন্তরায়ৈরবিহিতো যদি ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ ।
তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥ ২২ ॥

অন্তরায়ৈঃ—বাধা বিঘ্নের অন্তরায়ের দ্বারা; **অবিহিতঃ**—আক্রান্ত নয়; **যদি**—যদি; **ধর্মঃ**—বৈদিক অনুশাসনাদির মতো বিধিবদ্ধ কর্তব্যাদি পালন; **স্ব-অনুষ্ঠিতঃ**—সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত; **তেন**—তার দ্বারা; **অপি**—এমনকি; **নির্জিতম্**—সম্পন্ন; **স্থানম্**—মর্যাদা; **যথা**—যেভাবে; **গচ্ছতি**—বিনষ্ট হয়; **তৎ**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

যদি কেউ বৈদিক অনুশাসনাদি মতো বিধিবদ্ধ ভাবে যাগযজ্ঞাদি পালন করে, তা হলে পরজন্মে তার স্বর্গসুখ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন সুফল লাভ সত্ত্বেও, সকাম যাগযজ্ঞাদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হলেও, কালের প্রভাবে তা সবই বিলীন হয়ে যায়। এই বিষয়ে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

গচ্ছতি শব্দটির অর্থ 'চলে যায়'। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ*—জড়জাগতিক সকল প্রকার অভিজ্ঞতাই, ভাল হোক বা মন্দ হোক, আসে এবং চলে যায়। সুতরাং *গচ্ছতি* শব্দতি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সযত্নে অনুষ্ঠিত সকাম যাগযজ্ঞাদির ফল অন্তর্হিত হয়ে যায়। যে কোনও জড়জাগতিক পরিস্থিতি, তা অতি মন্দ বা অতি ভাল যাই হোক, অসম্পূর্ণ হয়েই থাকে। এই জন্যই শুধুমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা করাই উচিত।

শ্লোক ২৩

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ॥ ২৩ ॥

ইষ্ট্বা—আরাধনা করা হলে; ইহ—এই জগতে; দেবতাঃ—দেবতাগণ; যজ্ঞৈঃ—যাগযজ্ঞের মাধ্যমে; স্বঃ-লোকম্—স্বর্গলোকে; যাতি—যায়; যাজ্ঞিকঃ—যজ্ঞকর্তা; ভুঞ্জীত—ভোগ করতে পারে; দেব-বৎ—দেবতার মতো; তত্র—সেখানে; ভোগান্—সুখভোগ; দিব্যান্—স্বর্গীয়; নিজ—স্বয়ং; অর্জিতান্—অর্জন করে।

অনুবাদ

যদি কেউ এই পৃথিবীতে দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তা হলে স্বর্গলোকে গমন করে, সেখানে, দেবতাদের মতোই, তার যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত স্বর্গসুখ ভোগের সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৪

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে ।
গন্ধর্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেষধৃক্ ॥ ২৪ ॥

স্ব—তার নিজের; পুণ্য—পুণ্যকর্মের ফলে; উপচিতে—সঞ্চিত; শুভ্রে—সমুজ্জ্বল; বিমানে—আকাশযানে; উপগীয়তে—সঙ্গীতের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে; গন্ধর্বৈঃ—স্বর্গলোকের গন্ধর্বগণের দ্বারা; বিহরন্—জীবন উপভোগের মাধ্যমে; মধ্যে—মাঝে; দেবীনাম্—স্বর্গলোকের দেবীগণের; হৃদ্য—মনোরম; বেষ—পোশাক; ধৃক্—পরিধান করে।

অনুবাদ

স্বর্গলোক লাভ করবার পরে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা পৃথিবীতে তার পুণ্য কর্মের ফলে প্রাপ্ত সমুজ্জ্বল বিমানে ভ্রমণ করতে থাকে। গন্ধর্বগণের দ্বারা বাদ্য গীতের মাধ্যমে অভ্যর্থিত হয়ে, এবং মনোরম বেশভূষা পরিধান করে, সে স্বর্গের দেবীগণ পরিবৃত হয়ে জীবন সুখ উপভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ।
ক্রীড়ন্ ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীভিঃ—স্বর্গীয় স্ত্রীলোকদের সাথে; কাম-গ—যথেচ্ছ ভ্রমণে; যানেন—ঐ ধরনের বিমানে; কিঙ্কিনী-জাল-মালিনা—ঘন্টা-মালায় শোভিত হয়ে; ক্রীড়ন্—সুসময়ে অতিবাহিত; ন—না; বেদ—চিন্তা করে; আত্ম—নিজের কথা; পাতম্—পতিত হয়; সুর—দেবতাদের; আক্রীড়েষু—প্রমোদ-কাননগুলিতে; নির্বৃতঃ—আহ্লাদিত, বিশ্রামরত এবং সুখী হয়ে।

অনুবাদ

যজ্ঞফলের ভোক্তা ঘন্টা মালায় সুশোভিত স্বইচ্ছায় গমনরত বিমানে স্বর্গের নারীগণের সাথে প্রমোদ কাননগুলিতে আহ্লাদিত, বিশ্রামরত এবং মহাসুখে অতিবাহিত করার সময়ে, তারা বিবেচনা করেনা যে, তার পুণ্যফল সে ব্যয় করে ফেলছে এবং অনতিবিলম্বে জড় জগতে সে অধঃপতিত হবে।

শ্লোক ২৬

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ২৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; সঃ—সে; মোদতে—জীবন উপভোগ করে; স্বর্গে—স্বর্গলোকে; যাবৎ—যতক্ষণ; পুণ্যম্—তার পুণ্যফলে; সমাপ্যতে—সমাপ্ত হয়; ক্ষীণ—নিঃশেষিত হয়; পুণ্যঃ—তার পুণ্যকর্ম; পততি—সে অধঃপতিত হয়; অর্বাক্—স্বর্গ থেকে নিচে; অনিচ্ছন্—পতনে অনিচ্ছুক; কাল—কালক্রমে; চালিতঃ—চালিত হয়ে।

অনুবাদ

যজ্ঞকর্তার পুণ্যফল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে সে জীবন উপভোগ করতে থাকে। অবশ্য যখন পুণ্যফল ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন সে স্বর্গের প্রমোদ কাননগুলি থেকে অধঃপতিত হয়, এবং অনন্ত কালের প্রভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পরিচালিত হতে হয়।

শ্লোক ২৭-২৯

যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥ ২৭ ॥
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্ ।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ ॥ ২৮ ॥
কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ ॥ ২৯ ॥

যদি—যদি; **অধর্ম**—ধর্মহীন কাজে; **রতঃ**—নিয়োজিত; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গদোষে; **সতাম্**—জড়জাগতিক মানুষদের সাথে; **বা**—কিংবা; **অজিত**—জয় করতে না পারার ফলে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **কাম**—জড়জাগতিক কামেচ্ছা; **আত্মা**—ভোগের জন্য বেঁচে থাকা; **কৃপণঃ**—কৃপণের মতো; **লুব্ধঃ**—লোভী; **স্ত্রৈণঃ**—নারীলোভী; **ভূত**—অন্যান্য জীবগণের বিরুদ্ধে; **বিহিংসকঃ**—হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে; **পশূন্**—পশুগণ; **অবিধিনা**—বৈদিক অনুশাসন বিরোধী; **আলভ্য**—হত্যা করে; **প্রেত-ভূত**—ভূতপ্রেতগণ; **গণান্**—দলগুলি; **যজন্**—পূজা করে; **নরকান্**—নরকের দিকে; **অবশঃ**—কর্মফলের প্রভাবে অসহায়ভাবে; **জন্তুঃ**—জীব; **গত্বা**—গিয়ে; **যাতি**—অভিমুখে; **উল্বণম্**—চরম; **তমঃ**—অন্ধকার; **কর্মাণি**—কাজকর্ম; **দুঃখ**—গভীর অশান্তি; **উদর্কাণি**—ভবিষ্যতে নিয়ে এসে; **কুর্বন্**—অনুষ্ঠান করে; **দেহেন**—সেই দেহটি দিয়ে; **তৈঃ**—সেই ধরনের কাজকর্মে; **পুনঃ**—আবার; **দেহম্**—জড় দেহ; **আভজতে**—গ্রহণ করে; **তত্র**—তার মধ্যে; **কিম্**—কি; **সুখম্**—সুখ; **মর্ত্য**—সর্বদা মৃত্যু অভিমুখী; **ধর্মিণঃ**—ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত।

অনুবাদ

যদি কোনও মানুষ পাপময়, ধর্মবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, অসৎসঙ্গ কিংবা ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষমতার জন্য, তাহলে তাকে অবশ্যই জড়জাগতিক কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে হয়। তার ফলে অন্য সকলের প্রতি তার আচরণ হয় অশালীন লোভময় এবং সর্বদাই নারীদেহ সম্ভোগে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। মন কলুষিত হলে মানুষ হিংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে আর বৈদিক অনুশাসন ব্যতিরেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে। ভূতপ্রেতাদির পূজা করার ফলে, বিভ্রান্ত মানুষ অনুমোদিত কাজকর্মে পটুত্বলাভ করে এবং তার ফলে তার নরকগতি হয়, যেখানে সে তমোগুণান্বিত জড়জাগতিক শরীর লাভ করে। তেমন নিম্নস্তরের শরীর নিয়ে সে দুর্ভাগ্যবশত অশুভ ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে থাকে যার ফলে ভবিষ্যতের অশান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তাই সে আবার একটি অনুরূপ শরীর অর্জন করে। এই ধরনের যেসব কাজকর্মের মাধ্যমে অবধারিতভাবে মৃত্যুর মাঝে ইহজীবনে পর্যবসিত হবে, তার মধ্যে কি ধরনের সুখের আশা করা সম্ভব হতে পারে?

তাৎপর্য

সভ্যতার জীবনধারা বিশ্লেষণে বৈদিক ব্যাখ্যায় দুটি পথ রয়েছে। নিবৃত্তি মার্গের পথ যে স্বীকার করে, সে অচিরেই জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করে এবং কৃচ্ছ্রতা সাধন ও ভগবদ্ভক্তিমূলক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তার জীবনধারা পরিশুদ্ধ

করে তোলে। প্রবৃত্তিমার্গের ধারায় মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদির সন্তুষ্টির জন্য অবিরামভাবে উপাদান সরবরাহ করতে থাকে, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়গুলিকে সে কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে কাজে লাগায় এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে থাকে, যাতে সেইভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ করে তোলার মাধ্যমে জড়েন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত রাখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই শ্লোকে এবং পূর্ববর্তী শ্লোকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেইভাবে প্রবৃত্তিমার্গের মাধ্যমে প্রবল শক্তি কাজে লাগিয়ে চলতে হয়, অবশ্য তার ফলে অনাসক্তি অভ্যাস সম্ভব হয় না, ফলে জীব অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং আরও বেশী ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে পূর্ণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধনের সুনিয়ন্ত্রিত, বিধিবদ্ধ, প্রামাণ্য উপায়গুলি বিবৃত হয়েছে, এবং এই শ্লোকগুলিতে অননুমোদিত, আসুরিক ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা বলা হয়েছে।

এই শ্লোকগুলিতে, প্রথমেই *সঙ্গাৎ অসতাম্ বাজিতেন্দ্রিয়ঃ* শব্দসমষ্টির দ্বারা অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলা হয়েছে যে, অসৎ সঙ্গের ফলে মানুষ পাপময় জীবনে অধঃপতিত হতে পারে, কিংবা সৎ সঙ্গের ফলেও মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। অবশ্যই প্রত্যেক জীবকে তার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। এই শ্লোকে *অধর্মরতঃ* শব্দটি তাদের বোঝায় যে, যারা অত্যধিক মৈথুনাচার, আমিষাহার, আসবপান এবং অন্যান্য অশুভ কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, যাতে মানব জীবনের সভ্যতার রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়। অজ্ঞানতার ফলে তমোগুণাশ্রিত হওয়ার ফলে, ঐসব মানুষ এমন নিষ্ঠুর মানসিকতা অর্জন করে যে, তারা যে কোনও উৎসবে অসহায় প্রাণীদের হত্যা করে প্রচুর পরিমাণে মাংস ভোজনের আয়োজন ছাড়া পরিতৃপ্ত হতে পারে না। তার পরিণামে, ঐ ধরনের লোকগুলি ভূতপ্রেতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, এবং ঐ ভূতপ্রেতগুলির প্রভাবে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য বিচার করতে পারার সকল ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। তাদের সকল রকম সৌজন্যবোধ হারিয়ে জড়জাগতিক জীবনধারার অন্ধকারময় পরিবেশে বিচরণের সবরকম যোগ্যতাই অর্জন করতে পারে। কখনও বা এই সমস্ত বাসনাময় লোভাতুর, নেশাগ্রস্ত মাংসভুক জীবগুলি নিজেদের পুণ্যবান মানুষ বলে মনে করার ফলে ভগবানের উদ্দেশ্যে অনর্থক অসংলগ্নভাবে প্রার্থনা জানাতে চেষ্টাও করে। অগণিত জড়জাগতিক কামনা বাসনায় জর্জরিত হয়ে, তারা কোনও রকম যথার্থ সুখ উপভোগ না করেই একটি জড়জাগতিক শরীর থেকে অন্য শরীরে পরিভ্রমণ করতেই থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর মন্তব্য করেছেন

যে, জড়জাগতিক জীবনধারা এমনই বিভ্রান্তিকর যে, কোনও জীবকে যদি এর মাঝে ব্রহ্মার একটি সম্পূর্ণ দিন প্রায় ৮,৬৪০,০০০,০০০ বছর, বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়, তা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর ভয়ে ভীতগ্রস্ত হয়ে থাকতেই হবে। বাস্তবিকই ব্রহ্মা স্বয়ং মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন, তাই ক্ষুদ্র মানবজীবের কথা আর কী বলার আছে, কারণ মানুষ বড় জোর সত্তর কিংবা আশী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তাই এখানে বলা হয়েছে, *কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ*—জড়জাগতিক মায়ামোহময় যাতনার কবলে কোন্ সুখ জীব আশা করতে পারে?

শ্লোক ৩০

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ ভয়ং কল্পজীবিনাম্ ।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ ॥ ৩০ ॥

লোকানাম্—সকল গ্রহলোকে; **লোক-পালানাম্**—এবং সকল লোকপালবর্গের অর্থাৎ দেবতাদের; **মৎ**—আমার; **ভয়ম্**—ভয় আছে; **কল্প-জীবিনাম্**—যারা এক কল্প, অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিন সময়ের জন্য জীবিত থাকেন; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **অপি**—এমন কি; **ভয়ম্**—ভয় আছে; **মত্তঃ**—আমার কাছ থেকে; **দ্বি-পরার্ধ**—দুই পরার্ধ, অর্থাৎ মোট ৩,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর; **পর**—পরম; **আয়ুষঃ**—আয়ুষ্কাল।

অনুবাদ

সমস্ত গ্রহলোকে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত, এবং সমস্ত মহান দেবতাগণ যাঁরা এক হাজার যুগকল্পকাল জীবিত থাকেন, তাঁদের মনে আমার মহাকাল সম্পর্কে বিলক্ষণ ভয়ভীতি রয়েছে। স্বয়ং ব্রহ্মাও যাঁর পরম আয়ুষ্কাল ৩,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর, তিনিও আমাকে ভয় করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রের সর্বত্রই প্রামাণ্য বহু উল্লেখ আছে যে, মহান দেবতারাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহাকাল শক্তিকে ভয় করে থাকেন। স্বর্গলোকগুলিতেও জড়জাগতিক দুঃখকষ্টের কোনও অব্যাহতি নেই। কোনও বদ্ধ জীবই অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে না, তা সুস্পষ্টভাবেই হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য অসুরদের মৃত্যুর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যেহেতু দেবতারাও পরমেশ্বর ভগবানের মহাকালের শক্তিকে ভয় করেন, তাহলে মানুষ অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব এবং সকলের আর সব কিছুরই পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম আশ্রয়।

শ্লোক ৩১

গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্ ।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্ক্তে কর্মফলান্যসৌ ॥ ৩১ ॥

গুণাঃ—জড়েন্দ্রিয়গুলি; *সৃজন্তি*—সৃষ্টি করে; *কর্মাণি*—পাপ ও পুণ্য কর্মাদি; *গুণঃ*—প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য; *অনুসৃজতে*—সক্রিয় হয়; *গুণান্*—জড়েন্দ্রিয়গুলি; *জীবঃ*—অনুপরিমাণ জীবসত্তা; *তু*—অবশ্য; *গুণঃ*—জড়েন্দ্রিয় অথবা প্রকৃতির জড়গুণাবলী; *সংযুক্তঃ*—পূর্ণভাবে নিয়োজিত; *ভুঙ্ক্তে*—অভিজ্ঞতা অর্জন করে; *কর্ম*—ক্রিয়াকলাপের; *ফলানি*—বিভিন্ন কর্মফল; *অসৌ*—চিন্ময় আত্মা।

অনুবাদ

জড়েন্দ্রিয়গুলি পাপ অথবা পুণ্যময় জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উদ্ভব ঘটায় এবং জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্য ধারায় জড়েন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে থাকে। জড়েন্দ্রিয়গুলি এবং জড়াপ্রকৃতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে জীব সকাম ক্রিয়াকলাপের বিবিধ ফলের অভিজ্ঞতা ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সকাম ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে জীব নারকীয় জীবনধারায় অধোগতি লাভে বাধ্য হয়। এই শ্লোকটিতে, সকাম কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল জীবের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যে কেউ লক্ষ্য করতে পারে যে, জড়েন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই মানুষের কাজকর্ম সাধিত হয়ে থাকে, এবং জীব ঐ ধরনের কাজকর্ম সম্পর্কে শুধুমাত্রই সচেতন থাকে। কোনও মানুষ দেবতাদের পূজা আরাধনা করতে পারে, মৈথুন সুখ উপভোগ কিংবা কৃষিকর্ম অথবা বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই জড়েন্দ্রিয়গুলি সেই সকল কাজ করতে থাকে।

কেউ হয়তো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, চিন্ময় আত্মাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকর্ম উদ্দীপিত করে থাকে এবং তাই আত্মাই সকল কর্মের কর্তা, কিন্তু এই ধরনের ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা এই শ্লোকটিতে নস্যাৎ করে বলা হয়েছে—*গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্*। প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়েন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপকে উদ্দীপিত করে থাকে এবং বিশেষ ভাবে কোন একটি প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যদোষে প্রভাবিত তথা, নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলেই তার কাজের ভাল এবং মন্দ পরিণাম সে ভোগ করতে থাকে। এর দ্বারা মানুষের স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায় না, যেহেতু জীব জড়াপ্রকৃতির বিভিন্ন

গুণাবলীর সাথে আত্মস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিজেই করে থাকে। আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা, মৈথুনাদি, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি সকল কাজের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির বিবিধ গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে, এবং তার মাধ্যমেই বিশেষ ধরনের মানসিকতা অর্জন করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির গুণাবলীই সক্রিয় হয়ে থাকে, জীব সেইভাবে সক্রিয় হয় না। এই শ্লোকটিতে *অসৌ* শব্দটি বোঝায় যে, প্রকৃতির দ্বারাই নিষ্পন্ন ক্রিয়াকলাপকে জীব নিজেরই দ্বারা সম্পন্ন ক্রিয়াকর্ম বলে ভ্রান্তধারণা পোষণ করে থাকে। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মানি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা' এই রকম অভিমান করে।" মায়া নামে অভিহিত শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের তটস্থা শক্তি তথা জীব ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং মিথ্যা অহমিকাপূর্ণ জীবনধারা বর্জন করলে বদ্ধ জীব মুক্তিলাভের সহজ পথ খুঁজে পেতে পারে। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমেই জীবের মুক্ত সত্তা তার সচ্চিদানন্দ যথার্থ রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

সুফল প্রত্যাশা করেই কর্ম সম্পাদন করা স্বাভাবিক। তবে ভগবানের প্রেমময় সেবকরূপে তার স্বরূপ মর্যাদায় পুনরধিষ্ঠিত হওয়ার বাসনায় ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনে যে আত্মনিয়োগ করে, তার পক্ষেই অবশ্য সর্বোত্তম সুফল অর্জন করা যেতে পারে। এইভাবেই কোনও বিশেষ ফললাভের জন্য মানুষের নিজের কাজকর্মের উপযোগ সাধনের প্রবণতা পরিশুদ্ধ করে তোলা যেতে পারে; তা হলে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দোষ এবং জড়েন্দ্রিয়গুলি আর জীবকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। জীবের শুদ্ধ সত্তা সদা আনন্দময়। এবং তার মায়ামোহ যখনই নিষ্ক্রিয় হয়, তখন সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান ঘটে। মুক্ত জীব তখন ভগবানের ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করার যোগ্যতা অর্জন করে।

শ্লোক ৩২

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **স্যাৎ**—আছে; **গুণ**—জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী; **বৈষম্যম্**—ভিন্ন অস্তিত্ব; **তাবৎ**—তাহলে থাকবে; **নানাত্বম্**—বিভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব; **আত্মনঃ**—

আত্মার; নানাত্বম্—বিভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব; আত্মনঃ—আত্মার; যাবৎ—যতদিন থাকে; পারতন্ত্র্যম্—নির্ভরশীলতা; তদা—তখন থাকবে; এব—অবশ্যই; হি—সুনিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

যতক্ষণ জীব মনে করে যে, জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, ততদিন তাকে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং বিবিধ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করবে। তাই প্রকৃতির গুণাবলীর অধীনস্থ হয়ে সকাম ক্রিয়াকলাপের উপরেই জীবকে সম্পূর্ণ ভরসা করে চলতে হয়।

তাৎপর্য

গুণবৈষম্যম্ শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃতিই মানুষকে জড় জাগতিক বৈচিত্র্যগুলিকে পৃথক সত্তারূপে উপলব্ধির প্ররোচনা দেয়। জড়জাগতিক বিচিত্ররূপগুলিতে আকৃষ্ট হয়ে এবং সেইগুলির প্রতি আস্থা পোষণের ফলে, জীব বিভিন্ন জড়দেহের মধ্যে এই সকল বিচিত্র রূপগুলির অভিজ্ঞতা উপভোগে বাধ্য হয়। এই কারণেই দেবদেবী, শুয়োর-কুকুর, ব্যবসায়ী, পোকামাকড় এবং এই ধরনের সব জীবসত্তাকেই সে সমান মর্যাদা দেয়। কর্মমীমাংসা ভাবধারার দার্শনিকদের অভিমত অনুসারে, সমস্ত বিদ্যমান সৃষ্টির পেছনে দিব্য জীবসত্তা বলতে কিছুই নেই। তারা জড়জাগতিক বৈচিত্র্যকেই চরম বৈচিত্র্য বলে স্বীকার করে থাকে। অবশ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর যথার্থ ভিত্তি বা উৎস। তাঁর মধ্যেই সবকিছু রয়েছে এবং তিনিও সব কিছুর মধ্যে রয়েছেন। শুদ্ধভক্ত সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে থাকেন এবং প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ সমস্ত প্রকার গুণাবলীর মধ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে দেখতে পায় না, সে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যময়তাকেই পরম সত্য বলে লক্ষ্য করতেই থাকে। সেই ধরনের দৃষ্টি অনুভূতিকেই বলা হয় *মায়া,* অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত উপলব্ধি, এবং তা যেন কোনও পশুর দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়। *পারতন্ত্র্যম্* শব্দটির অর্থ বহিরাবরণ দেখে বিভেদমূলক দৃষ্টি বর্জন করতে না পারলে, মানুষকে সকাম ক্রিয়াকলাপের মায়াজালেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

শ্লোক ৩৩

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্ ।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ—যতদিন; অস্য—জীবের; অস্বতন্ত্রত্বম্—জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের উপরে নির্ভরশীলতা থেকে কোনই মুক্তি নেই; তাবৎ—তখন তা হলে; ঈশ্বরতঃ—পরম

নিয়ন্তার কাছ থেকে; **ভয়ম্**—ভয়; **য**—যারা; **এতৎ**—জীবনের জড়জাগতিক ধারণা; **সমুপাসীরন্**—তাদের আত্মোৎসর্গ করে; **তে**—তারা; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়; **শুচা**—দুঃখশোকে; **অর্পিতাঃ**—নিত্য মগ্ন।

অনুবাদ

জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অধীন সকাম কর্ম সম্পাদনে যে বদ্ধজীব নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তার পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপ আমাকে সমীহ করতে থাকবেই, যেহেতু আমিই সকল জীবের সকাম ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করে থাকি। যারা প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের বৈচিত্র্যময়তাকে বাস্তবরূপে জ্ঞান করে, জড়জাগতিক জীবনধারা স্বীকার করে নেয়, তারা জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের মাঝে আত্মোৎসর্গ করে থাকে বলেই সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশার মাঝে মগ্ন হতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

মায়ামোহজালে জীব আবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু পরম শক্তির সে অধীনে রয়েছে তা উপলব্ধি করলেও পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে চায় না। তাই এই জীবনেরই নানাপ্রকার ভয় ভাবনায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় উপভোগের কামনা-বাসনায়, জীব মাত্রই কংসাসুরের মতো সদা সর্বদাই তার জড়জাগতিক সমস্ত আয়োজনেরই ধ্বংস বিনাশ নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দিনযাপন করতে থাকে। জড়া প্রকৃতির আস্বাদনে আকৃষ্ট হয়ে থাকার ফলে, মানুষ যুক্তিবিবর্জিত জীবনধারায় ক্রমশ নিমজ্জিত হয়।

মায়ার দুটি শক্তি আছে—প্রথমটি জীবকে আচ্ছন্ন করে, এবং দ্বিতীয়টি তাকে জীবনের নারকীয় পরিবেশে নিক্ষেপ করে থাকে। মায়ায় আচ্ছন্ন হলে, মানুষ বিচার বিবেচনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে, এবং মায়া তখন তাকে বুদ্ধিহীন বিবেচনা করার ফলে নারকীয় জীবনধারায় নিক্ষেপ করে থাকে এবং সে তখন অজ্ঞানতার অন্ধকার রাজ্যে নিমজ্জিত হয়। যখন মানুষ বিভ্রান্তভাবে নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মানতে চায় না, তখন সে অনিত্য অস্থায়ী জড়জাগতিক নানা বিষয় নিয়ে আরাধনা করতে থাকে এবং আশা করতে থাকে যে, জড়েন্দ্রিয়গুলির পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সে বিপুল সুখাস্বাদন করতে পারবে, এবং মানুষ বয়োবৃদ্ধ হতে থাকলে, ক্রমশ ভয় এবং আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বদ্ধ জীব মনে করে তার জীবনে সে, আত্মনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জীবন সংযত রাখতে পারবে, কিন্তু যেহেতু তার আত্মনিয়ন্ত্রণের তেমন পন্থাই তার জানা নেই, তাই তার

জীবদশা বিপরীতধর্মী হয়ে ওঠে এবং মোটেই সুখকর হয় না। কালের প্রভাবে যখন তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ অপহৃত হতে থাকে, তখন তার মন দুঃখবেদনায় ভরে ওঠে। সবদিক দিয়েই, জড়জাগতিক জীবনধারা বাস্তবিকই ভয়াবহ এবং গভীর মায়ামোহজনিত পরিবেশের ফলেই তাকে আমরা স্বীকার করে নিই।

শ্লোক ৩৪

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥ ৩৪ ॥

কালঃ—সময়; **আত্মা**—স্বয়ং; **আগমঃ**—বৈদিক জ্ঞান; **লোকঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **স্বভাবঃ**—বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রকৃতি; **ধর্মঃ**—ধর্মনীতিসমূহ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **মাম্**—আমাকে; **বহুধা**—বহুপ্রকারে; **প্রাহুঃ**—তারা ডাকে; **গুণ**—প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যাবলী; **ব্যতিকরে**—উত্তেজনা; **সতি**—যেখানে আছে।

অনুবাদ

প্রকৃতির জড়গুণাবলীর প্রভাবে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জীব আমাকে নানাভাবে বর্ণনা করতে থাকে, কখনও মহাকাল, আত্মা, বেদ, ব্রহ্মাণ্ড, স্বভাব, ধর্মনীতি এবং আরও নানাভাবে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রজাতির জীবনধারায় দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, গাছপালা ইত্যাদি কিভাবে ক্রমশ তাদের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের বিকাশ ঘটায়, তা লক্ষ্য করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সম্পর্কে মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। প্রত্যেক প্রজাতির জীবনধারার মধ্যে দিয়েই এক এক ধরনের বিশেষ প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়ে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সেই প্রজাতির *ধর্ম*। পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে, সাধারণ মানুষেরা উপরে বর্ণিত অভিব্যক্তিগুলির মাঝে ভগবানের শক্তির সামান্য পরিচয় লক্ষ্য করে থাকে। শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নরূপ তথ্যসম্ভার *তন্ত্রভাগবত* থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ভগবানকে বলা হয় কাল, অর্থাৎ সময়, কারণ তিনিই সকল জড়জাগতিক গুণাবলীর সঞ্চালক এবং নিয়ামক। যেহেতু তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্থকসিদ্ধ সত্তা, তাই তাঁকে বলা হয় *আত্মা*, অর্থাৎ আত্মসত্তা; এবং তিনি সকল জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। *স্বভাব* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান তাঁর লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্পূর্ণভাবে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন; এবং প্রত্যেক জীবেরই প্রতিপালন তিনি করে থাকেন, তাই তাঁর নাম ধর্ম। মুক্ত পর্যায়ে সমুন্নত মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে অনন্ত

আশীর্বাদ ও পরম সুখশান্তি অর্জন করতে পারেন, অথচ ভগবৎ মাহাত্ম্য সম্পর্কে অজ্ঞজনেরা অন্য কোনও বিষয়াদির পূজা-অর্চনার মনগড়া কল্পনার মাধ্যমে ভগবদ্‌-আরাধনার অর্থ অন্বেষণ করতে থাকে। যদি কেউ অন্ধমত অনুসারে অবুঝের মতো ধারণা পোষণ করে থাকে যে, সবকিছুই শ্রীভগবানকে ছাড়াই চলছে, তবে ভগবানের শক্তিরাজির মায়াময় জালচক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। জড়জাগতিক সবকিছুরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য করার ফলে, মানুষ নিত্য ভয়ভীত হয়ে থাকে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে অবিরাম দুঃখ ভোগ করতেই থাকে। সেই অন্ধকারের মাঝে সুখের প্রত্যাশা করার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব কোনও মানুষেরই চিন্তা করা অনুচিত যে, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র সামর্থ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যে মুহূর্তে মানুষ মনে করে যে, সবকিছু ভগবানকে ছাড়াই হয়েছে, তখনই সে ভগবানের *মায়া* নামে ভয়াবহ শক্তির কবলিত হয়ে যায়। তাই সদাসর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে বিনীত মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকা উচিত, এমন কি যখন মুক্তি ভাবাপন্ন হওয়া যায়, তখনও ভগবানের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা কর্তব্য, এবং তবেই পরম চিন্ময় সুখ ভোগ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ

গুণেষু বর্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ ।
গুণৈর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যে; **বর্তমানঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **দেহ**—জড় দেহ থেকে; **জেষু**—জাত; **অনপাবৃতঃ**—অনাবৃত হয়ে; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা; **ন**—না; **বধ্যতে**—বাধ্য; **দেহী**—জড় দেহের মধ্যে জীব; **বধ্যতে**—আবদ্ধ হয়; **বা**—কিংবা; **কথম্**—তা কিভাবে ঘটে; **বিভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবকে ঘিরে থাকে জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী এবং এই সকল গুণাবলীর দ্বারা সৃষ্ট কর্মফলের সুখ ও দুঃখ। তাহলে এই জড়জাগতিক আবর্তের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না, তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আরও বলা যেতে পারে যে, জীব যথার্থই দিব্য সত্তা এবং জড় জগতের মাঝে তার করণীয় কিছুই নেই। তবে কেন সে চিরকাল জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে?

তাৎপর্য

জড়াপ্রকৃতির প্রভাবে জড়দেহ সকাম ক্রিয়াকলাপের সৃষ্টি করতে থাকে বলেই তার পরিণামে জড়জাগতিক সুখ এবং দুঃখ জাগে। *দেহজেষু* শব্দটির মাধ্যমে এই জড়জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের পরিণাম বোঝানো হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এখানে উদ্ধবকে বুঝিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয় উপভোগ নয়, ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে মুক্তি লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। যদিও ভগবান বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান ও অনাসক্তির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের ফলে জীব মুক্তিলাভ করে থাকে, তবু উদ্ধব আপাতদৃষ্টিতে শুদ্ধ সার্থকতা অর্জনের সবিশেষ পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি বলেই প্রতিভাত হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, উদ্ধবের প্রশ্ন থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, মুক্তাত্মা পুরুষগণের কার্যকলাপের মধ্যেও আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, শ্রবণ, বাচন প্রভৃতি যে সব বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে থাকি, সেগুলির স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহসঞ্জাত ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। তাই যদি মুক্ত পুরুষেরাও স্থূল সূক্ষ্ম দেহগুলির অবস্থান করতে থাকেন, তবে কেমন করে তাঁরাও জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা আবদ্ধ হন না? যদি যুক্তিবিচার মাধ্যমে বলা যায় যে, জীব যেন আকাশেরই মতো, যে আকাশ অন্য কোনও বস্তুর সাথে কখনই সংমিশ্রিত হয়ে যায় না এবং সেই কারণেই আকাশ কোনও কিছুর সাথেই বদ্ধ অবস্থায় থাকে না, তা হলে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মুক্ত পুরুষের মতো কোনও এক দিব্য জীবও জড়া প্রকৃতির দ্বারা কিভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে? অন্যভাবে বলা চলে যে, জড়জাগতিক অস্তিত্ব কেমন করে সম্ভব? কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পন্থা পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই উদ্ধব এই প্রশ্নটি পরম দিব্যজ্ঞানের অধিকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

মায়ার রাজ্যে পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে অসংখ্য কল্পনা হয়ে থাকে, যেগুলির মাধ্যমে নানাভাবে তাঁকে অস্তিত্বহীন, কিংবা জড়গুণাশ্রিত, কিংবা সম্পূর্ণ গুণবর্জিত, অথবা নপুংসকের মতো ক্লীবসত্তা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তুচ্ছ কল্পনাদির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রকৃতি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। সুতরাং পারমার্থিক দিব্য মুক্তি অর্জনের পন্থা সুপরিচ্ছন্ন করে তোলার বাসনায় উদ্ধব ইচ্ছা করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণই, তা যেন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যতক্ষণ মানুষ জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যে প্রভাবিত হতে থাকবে, ততক্ষণ যথার্থ উপলব্ধি এই বিষয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন উদ্ধবের কাছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযোগী দিব্য মুক্তি পথের আরও বিশদ নির্দেশ প্রদান করবেন।

শ্লোক ৩৬-৩৭

কথং বর্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা ॥ ৩৬ ॥
এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর ।
নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কথম্—কিভাবে; **বর্তেত**—অবস্থিত; **বিহরেৎ**—বিহার করে; **কৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **জ্ঞায়েত**—জানা যাবে; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণাদির দ্বারা; **কিম্**—কি; **ভুঞ্জীতঃ**—আহার করবে; **উত**—এবং; **বিসৃজেৎ**—বর্জন করবে; **শয়ীত**—শয়ন করবে; **আসীত**—বসবে; **যাতি**—যায়; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **মে**—আমাকে; **ব্রূহি**—ব্যাখ্যা করে; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **প্রশ্ন-বিদাম্**—যাঁরা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে জানেন; **বর**—হে শ্রেষ্ঠ; **নিত্য-বদ্ধঃ**—নিত্যকাল যাবৎ বদ্ধজীব; **নিত্য-মুক্তঃ**—নিত্যকাল যাবৎ মুক্ত প্রাণ; **একঃ**—একক; **এব**—অবশ্য; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমাকে; **ভ্রমঃ**—ভ্রান্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান অচ্যুত, একই জীবকে কখনও নিত্যবদ্ধ এবং কখনও নিত্যমুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই, জীবের যথার্থ অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারি না। হে ভগবান, দার্শনিক প্রশ্নাদির উত্তর প্রদানে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিত্যমুক্ত জীব এবং নিত্যবদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির লক্ষণগুলি কৃপা করে আমাকে বুঝিয়ে দিন। তারা কি কি বিভিন্ন উপায়ে জীবন উপভোগ করে, আহার গ্রহণ করে, মল বর্জন করে, শয়ন করে, উপবেশন করে কিংবা বিচরণ করে, তা সবই বর্ণনা করবেন কি?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা সহকারে উদ্ধবকে বুঝিয়েছেন যে, নিত্যমুক্ত পুরুষ জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত বিরাজ করেন। যেহেতু নিত্যমুক্ত পুরুষকে সত্ত্বগুণেরও অতীত বিরাজমান বলে মনে হয়, তা হলে কিভাবে তাঁকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে? জড়া প্রকৃতির সাথে বৃথা স্বরূপ চিন্তার ফলে মানুষের জড় শরীরের সৃষ্টি হয় বলে, মানুষকে মায়ামোহগ্রস্ত হতেই হয়। অন্য দিকে, জড়াপ্রকৃতির গুণাতীত হতে পারলে, মানুষ মুক্ত সত্তা অর্জন করে। অবশ্য, আহার, নিদ্রা, বর্জ্যত্যাগ, বিশ্রাম বিহার, উপবেশন ও শয়নে মুক্তাত্মা পুরুষ এবং বদ্ধ জীব একই প্রকার মনে হয়। তাই, উদ্ধব প্রশ্ন করেছেন, "কোন্ কোন্

লক্ষণাদির মাধ্যমে আমি বুঝতে পারব যে, কোনও জীব অহমিকাবর্জিত হয়ে ঐ সকল কাজ করছে, আর কোন কোন্ লক্ষণাদির মাধ্যমে আমি বুঝতে পারব যে, জড়জাগতিক দেহাত্মবুদ্ধির মায়াবন্ধনের অধীনস্থ হয়ে মানুষ ঐসব ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করছে? এই কাজ কঠিন, যেহেতু মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধ জীবের সাধারণ দৈহিক কার্যকলাপ সবই এক ধরনের মনে হয়।" পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আপন পারমার্থিক গুরুদেব রূপে স্বীকার করার মাধ্যমে উদ্ধব তাঁর কাছে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন এবং জড়জাগতিক ও পারমার্থিক জীবনধারার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির উপায়গুলি সম্পর্কে উপদেশ লাভ করতে চেয়েছেন।

যেহেতু অনেক সময়ে জীবকে নিত্যবদ্ধ রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তা হলে কেমন করে তাকে কোনও কোনও সময়ে নিত্য মুক্ত কিংবা তার বিপরীত সংজ্ঞায় ভূষিত করা যেতে পারে? এই আপাতবিরোধী বৈষম্য সম্পর্কে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সকাম কর্মের প্রকৃতি' নামক দশম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।